মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্য সমালোচনা

(Literary Criticism of Mikhail Nuaima)

(এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

তাছমিনা আফরোজ
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং -০৩ ,শিক্ষাবর্ষ- ২০১৪-২০১৫
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর, ২০২২

Literary Criticism of Mikhail Nuaima

(মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্য সমালোচনা)

(Thesis submitted for the award of the Degree of Master of Philosophy)

BY

Tasmina Afroj
Researcher
Reg. No-03, Session- 2014-15
Department of Arabic
University of Dhaka

Superviser
Dr. Zubair Muhammad Ehsanul Haque
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh

December, 2022

Dr. Zubair M Ehsanul Hoque
Professor
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka - 1000, Bangladesh.

الدكتور زبير محمد إحسان الحق
أستاذ
قسم العربية، جامعة داكا
داكا-1000، بنغلاديش.

Ref No. ……………………………………………

Diskus LT Std

Date …....................................

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের গবেষক তাছমিনা আফরোজ কর্তৃক উপস্থাপিত “মিখাইল নু‘আইমা’র সাহিত্য সমালোচনা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ বিশেষ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এর চূড়ান্ত আদ্যপান্ত দেখেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমাদানের সুপারিশ করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের লেখা বলে চালানো) নেই।

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Tel: +88-029661920-73 Ext:6115 **Fax**: +88-02-9615277 **Mob**:+8801711305846 **Email**: zubairehsan@du.ac.bd

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্য সমালোচনা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্নরূপে আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্যে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্যে আমি উপস্থাপন করিনি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের লেখা বলে চালানো) নেই।

(তাছমিনা আফরোজ)

এম.ফিল গবেষক

রেজি নং০৩

শিক্ষাবর্ষ-২০১৪-১৫

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত কৃতজ্ঞতাা ও প্রশংসা অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যার অশেষ মেহেরবানীতে আমি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যার প্রদর্শিত পথ আমার চলার পথের পাথেয়।

আমি কৃতজ্ঞাতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণাকর্মের শ্রদ্ধাভাজন তত্ত্বাবধায়ক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যারের প্রতি। যার সৌহার্দ্যপূর্ণ সাহচর্য, তত্ত্বাবধায়ন, প্রয়োজনীয় ও আন্তরিক পরামর্শ ও সহযোগীতা আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে স্যার সহযোগীতা করে আমাকে বাধিত করেছেন।

কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যার নানা সময়ে নানাভাবে আমাকে সহযোগীতা করেছেন।

আমি গভীর শদ্ধা ও বিনম্রতার সাথে কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি আমার সকল প্রেরণার মূল উৎস আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা মোঃ শহীদ উল্লাহ্ ও পরম শ্রদ্ধেয় মাতা মাসুদা সুলতানার প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ভালোবাসা ও ত্যাগ অনুপ্রেরণায় আমি আমার শিক্ষজীবন সমাপ্ত করতে পেরেছি।

আমি আরো কৃতজ্ঞাতা জ্ঞাপন করছি আমার শাশুড়ি মা ফজিলা খানম যিনি আমার পাশে থেকে সবসময় আমার কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আল্লাহ আমার পিতা-মাতা, শাশুড়ি মার নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাদের হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন।

আমি গভীর কৃতজ্ঞাতার জ্ঞাপন করছি আমার জীবনসঙ্গীর প্রতি, যার অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা সহযোগীতা ও আন্তরিকতা না থাকলে হয়তো আজ আমি এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পারতাম না।

আমার অনেক ভালোবাসা আমার ছোট্ট দুই শিশুপুত্র তাশফীক জারিফ ও তাসদিক জাফিনের প্রতি, যারা আমাকে সকল কাজের ফাঁকে এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে সহযোগীতা করেছে।

আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার দুই বান্ধবী খোন্দকার নূরুল একা উম্মে হানী ও সুমাইয়া তাসনীম এবং ছোট ভাই মাসুদ হেলাল জব্বারের প্রতি যারা আমাকে নানাভাবে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগীতা করেছে। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শিক্ষাজীবনের সকল পর্যায়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের যাদের আন্তরিক উপদেশ, দোয়া

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর পরিশ্রমের কারণে আজ আমি আমার শিক্ষাজীবনের এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আল্লাহ্ তাদের সকল নেক দোয়া কবুল করুন ও নেক হায়াত বৃদ্ধি করুন।

মহান আল্লাহ পাক আমার এ গবেষণাকর্মটিকে কবুল করুন আমীন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ভাষা হলো আরবী। এটি একটি সুপ্রাচীন ভাষা। ইসলামের মূল উৎস কোরআন হাদীসের ভাষাও আরবী। আধুনিক যুগেও এ ভাষার ব্যবহার সার্বজনীন।

বিশ্বসাহিত্যেও আরবী সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন অসংখ্য ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরবী ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। আরবী সাহিত্যের সূচনা কবিতার মাধ্যমে শুরু হলেও পরবর্তীতে আধুনিক বিষয়গুলো এতে সংযুক্ত হয়। আরবী সাহিত্যে প্রাথমিক যুগে সমালোচনা থাকলেও আধুনিক যুগে এটি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, সমালোচক, নাট্যকার, গল্পকার মিখাইল নু'আইমা আরবী সাহিত্যের আকাশে, বিশেষ করে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে এক অনন্য মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। তিনি আরবী সাহিত্যের সমালোচনার পাশাপাশি আরবী ভাষারও সমালোচনা করে নতুন শব্দ ব্যবহারের পক্ষে মত দেন।

মিখাইল নু'আইমা রচিত সাহিত্যের ভাষা ছিলো সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য সাহিত্য রচনা করার কথা বলেছেন। শুধুমাত্র প্রাচীনদের অনুসরণ না করে প্রয়োজন ও অবস্থানুযায়ী আধুনিক ও মানুষের মুখে প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের কথা বলেছেন। তিনি সাহিত্যকে সহজ করার লক্ষ্যেই সাহিত্যের সমালোচনা শুরু করেন। তার সমালোচনার ধারা যেমন ছিল আধুনিক তেমনি বিষয়বস্তুও ছিল বৈচিত্রময়। ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যতা ছিল তার রচিত সাহিত্যের এক আলাদা বৈশিষ্ট্য।

'*গিরবাল*' মিখাইল নু'আইমা রচিত একটি বিখ্যাত সমালোচনামূলক গ্রন্থ। 'গিরবাল' শব্দের অর্থ চালুনি। এই বইটিতে তিনি চালুনির মতো ছেঁকে ছেঁকে আরবী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেন। তিনি সাহিত্যের প্রচলিত মানদণ্ডের পরিবর্তন করে সাহিত্যের নবায়নের জন্য কাজ করেন। বহুভাষাবিদ নু'আইমা রাশিয়ায় পড়ালেখা করার কারণে তার সাহিত্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমালোচনার মাধ্যমে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকায়নে কাজ করেন।

বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য সমালোচনায় গবেষণার প্রয়োজনের আলোকে অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে **'মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্য সমালোচনা'**। তিনি কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ ও অন্ত্যমিলের আবশ্যকীয়তাকে পরিহার করেছেন। নু'আইমা'র মতে সাহিত্য সমালোচনা হলো সাহিত্যের আবেগ, অনুভূতি ও ধারণার মূল্যায়ন। সাহিত্য সমালোচনা কীভাবে হবে, কেমন হবে, একজন উত্তম সমালোচকের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তিনি সেগুলোও খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন। তিনি কবিতার ব্যাপারে সুর ও ছন্দের চেয়ে অর্থের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কবিতার ভাষাকে তিনি রূপক অর্থে প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভাষায় অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাঁর মতে ভাষা হলো জীবনের বহিঃপ্রকাশ। জীবনের প্রয়োজনে ভাষার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হতে পারে। গদ্য সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি জীবনমুখী ও মানবকল্যাণে সাহিত্য রচনার কথা বলেছেন। তিনি নাটকে সংলাপের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা কথ্য ভাষা ব্যবহার করে সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করার কথা বলেছেন। তিনি তাঁর *গিরবাল* বইতে শিল্প ও সাহিত্যের অমরত্বের কথা বলেছেন।

উক্ত অভিসন্দর্ভে গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মূলত এই অভিসন্দর্ভের আলোচনা ও উপস্থাপনা বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। এই গবেষণাকর্মে উপস্থাপিত সমস্ত তথ্য-উপাত্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র, কবির দিওয়ান, লেখকের বই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য অভিসন্দর্ভ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করে নেওয়া হয়েছে।
এতদসত্ত্বেও জ্ঞানের স্বল্পতায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল থেকে গিয়েছে এবং **'মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্য সমালোচনা'** বিষয়টির ব্যাপকতার কারণে সব বিষয় উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। তারপরেও আমার এই প্রচেষ্টা বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকের আরবী সাহিত্য সমালোচনার ব্যাপারে জানার প্রত্যাশা কিছুটা হলেও মিটাবে বলে আমি আশাবাদী।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে মিখাইল নু'আইমা'র বর্নাঢ্য জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনার উপরে সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এত মোট চারটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করে আলোচনা করা হয়েছে।
প্রথম অধ্যায়ে মিখাইল নু'আইমা'র জীবন, তার বাল্যকাল, তার শিক্ষাজীবন, বহুভাষা শিক্ষা, তার কর্মজীবন, লেখালেখিতে তার যুক্ত হওয়া, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তার রচনাবলি, বিভিন্ন বিষয়ে তার চিন্তাধারা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার আস্থা ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন নিয়ে তার চিন্তাকে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নু'আইমা'র লেখার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন কবিতা ও গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র লিখন, জীবনী সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় তার অসামান্য অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে তার কবিতার বৈশিষ্ট্য, কবিতার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য সমালোচনা কী, কীভাবে সাহিত্য সমালোচনা করতে হয়, একজন উত্তম সমালোচকের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস, আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্য সমালোচনা, সমকালীন আরবী সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সমালোচনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আরবী সাহিত্য সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমা'র অবদান, নু'আইমা'র নতুন ধারার সাহিত্য সমালোচনা, আধুনিক সাহিত্যের মানদণ্ড কেমন হবে, গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের ভাষা ও ছন্দ কেমন হবে, *'গিরবাল'*-এ নু'আইমা সাহিত্য সমালোচনা এসকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণার সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দ সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
(আ)	আলাইহিস সালাম
(সা)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা)	রাদিয়াল্লাহু আনহু
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
হি.	হিজরি
পৃ.	পৃষ্ঠা
মৃ.	মৃত্যু
অনু.	অনুবাদ
ড./ ডঃ	ডক্টর
বি.দ্রঃ	বিশেষ দ্রষ্টব্য
pp.	Page
Vol.	Volume

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا	অ	ط	ত
ب	ঊ	ظ	য/জ
ت	ত	ع	’আ/”
ث	ছ	غ	গ
ج	জ	ف	উ
ح	ঘ	ق	ক্ব/ক
خ	খ	ك	ক
د	দ	ل	ল
ذ	ঐ	م	ম
ر	র	ن	ন
ز	য/জ	و	ওয়া
س	গ	ه	ঘ
ش	ক	ء	অ/আ
ص	ছ/স	ي	য়
ض	দ	اي	ী/ঈ

বি. দ্রঃ (উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন প্রচলিত নাম বা শব্দের ক্ষেত্রে প্রমিত বানান রীতি অনুসৃত হয়েছে।)

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রত্যয়নপত্র

ঘোষণাপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সারসংক্ষেপ

শব্দ সংকেত বিবরণী

প্রতিবর্ণায়ন

ভূমিকা **০১-০৪**

প্রথম অধ্যায় : মিখাঈল নু‘আইমা’র জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ: জন্ম ও বাল্যকাল ০৫-০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মিখাঈল নু‘আইমা’র শিক্ষাজীবন ০৯-১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নু‘আইমার কর্মজীবন ১৪-২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মিখাইল নু‘আইমার চিন্তাধারা ২৬-৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় : আরবী সাহিত্যে মিখাইল নু‘আইমার অবদান **৩২-৩৪**

প্রথম পরিচ্ছেদ: কাব্যে মিখাইল নু‘আইমার অবদান ৩৫-৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সমালোচনায় মিখাইল নু‘আইমার অবদান ৫৩-৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: গল্প ও উপন্যাসে মিখাইল নু‘আইমার অবদান ৫৮-৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নাটকে মিখাইল নু‘আইমার অবদান ৬৮-৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: জীবনী সাহিত্য ও ইতিহাসে মিখাইল নু‘আইমার অবদান ৭১-৭৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: প্রবন্ধ সাহিত্যে তার অবদান ৭৪-৭৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ: পত্র সাহিত্যে তার অবদান ৭৭-৭৮

তৃতীয় অধ্যায় : আরবী সাহিত্যে সমালোচনার ধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ: আরবী সাহিত্যে সমালোচনার ধারা ৭৯-৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস ৯০-১০২

চতুর্থ অধ্যায়: আরবী সাহিত্যে সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমার অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ: আরবী সাহিত্যে সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমার অবদান ১০৩-১২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: "গিরবাল" এ মিখাইল নু'আইমার সাহিত্য সমালোচনা ১২৫-১৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মিখাইল নু'আইমার কাব্যদর্শন ১৩৫-১৫৪

উপসংহার ১৫৫-১৫৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৫৮-১৬২

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারেরও অধিক ভাষার মধ্যে আরবী একটি অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ভাষা। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর মধ্যে আরবী একটি অতি প্রাচীন ভাষা। কিন্তু আধুনিক যুগেও এ ভাষার ব্যবহার সার্বজনীন। পৃথিবীতে আরবী ভাষার স্থান চতুর্থ। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত এ ভাষায় বর্তমানে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ কথা বলে। বিশ্বসাহিত্যে অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মধ্যে আরবী সাহিত্যও একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইসলামের মূল উৎস কোরআন হাদীসের ভাষাও আরবী। ইসলাম বিশ্বাসী প্রাচীন আরব মুসলিমগণ দেশ বিজয়ের পাশাপাশি ভাষাশিক্ষা বিস্তারেও ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। প্রাচীন অসংখ্য ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরবী ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। তাই বিশ্বময় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সর্বকালীন। পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যের মতো আরবী সাহিত্যেরও প্রাথমিক সূত্রপাত হয় কবিতার মাধ্যমে। প্রাক্-ইসলামী যুগে আরবী সাহিত্যে কবি ও কবিতার স্থান ছিলো অনেক উঁচুতে। পরবর্তীতে সাহিত্যের অনেক শাখা-প্রশাখার সাথে সাথে আরবী সাহিত্যে সমালোচনার বিষয়টিরও আবির্ভাব ঘটে। অন্যান্য সাহিত্যে সমালোচনা আব্বাসী যুগে শুরু হলেও আধুনিক যুগে এটি পরিপূর্ণতা পায়। সমালোচনা সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী ভাষা হয় আরো অনেক সমৃদ্ধ, উন্নত ও আধুনিক।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, সমালোচক, নাট্যকার, গল্পকার মিখাইল নু'আইমা আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে সমালোচনার মাধ্যমে এক অনন্য মর্যাদায় আসীন করেছেন। তিনি তার ধর্ম, দেশ, প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে উঠে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য কাজ করেছেন। একজন সমালোচক হিসেবে মিখাইল নু'আইমা একটি বিপ্লবের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন যা আধুনিক আরবী সাহিত্যে সমালোচনাকে নতুন আলোয় আলোকিত করেছে। তিনি সমালোচনা সাহিত্যে, ভাষা, নাটক, চিঠিপত্র লেখন, প্রবন্ধ রচনা, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি অনুবাদের ক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন কবি, সাহিত্যক আবার ছিলেন বিখ্যাত বক্তা।

মিখাইল নু'আইমা হলেন তৃতীয় সাহিত্যিক ব্যক্তি যিনি উত্তর আমেরিকার মাহজার কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আরব বিশ্বে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং একজন বিখ্যাত সমালোচক হিসেবে আধুনিক আরবী কবিতায় তার অবদান অবিস্মরণীয়। মিখাইল নু'আইমা সাহিত্যের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল করার জন্য লড়াই করেছেন। তিনি পদ্যের সাথে সাথে গদ্য সাহিত্যের ভাষাও সহজ করার জন্য কাজ করেছেন।

মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্যের এক আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো সাহিত্যের ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যতার সাথে সাথে পাঠকের জন্য ছিল প্রয়োজনীয় ও শেখার মতো অনেক কিছু। সাহিত্য সমালোচনার যে দ্বার তিনি উন্মোচিত করেছিলেন তার রচিত বিখ্যাত বই *'আল গিরবাল'* দিয়ে, সেটি আজও সাহিত্যিক মহলে সর্বজন কর্তৃক প্রশংসিত।

নু'আইমা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ভাষার স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি সাহিত্যের ভাষাকে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও প্রচলিত বা স্থান অনুযায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সাহিত্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ করতে চেয়েছেন। তিনি সাধারণ পাঠককে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাজ করেছেন। তিনি তার জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, সুখ, দুঃখ, আবেগ, ভালোবাসা, হতাশা, দেশপ্রেম সবকিছুই সাহিত্য রচনার মাধ্যমে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

তিনি সাহিত্য সমালোচনাকে নতুন ধারায় নিয়ে আসেন। তার সাহিত্য সমালোচনার ধারা যেমন ছিল আধুনিক আবার বিষয়বস্তুও ছিল বৈচিত্রময়। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অন্তমিলের আবশ্যকীয়তাকে পরিহার করেছেন। রাশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি সাহিত্যের অপ্রচলিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি সাহিত্য সমালোচনার সাথে সাথে একজন সমালোচকের কেমন বৈশিষ্ট্য হবে তা নিয়েও কথা বলেছেন।

নু'আইমা'র সমালোচনা সাহিত্য ছিলো বিচক্ষণ ও গঠনমূলক। তিনি কবিতার ভাষা ও ছন্দের ব্যাপারে সমালোচনা করে সেটাকে সহজবোধ্য করার ব্যাপারে কথা বলেছেন। তার মতে সাহিত্য

হলো চিন্তা ও আবেগ প্রকাশের মাধ্যম। তিনি কবিতার শব্দকে প্রতীক হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। মূলত শব্দের অর্থের দিকে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি কবিদেরকেও যুগোপযোগী শব্দ ব্যবহার করে কবিতা রচনা করার কথা বলেছেন।

তিনি তার ‘গিবরাল’ বইয়ে শিল্প-সাহিত্যের চিরন্তনতা বা অমরত্বের কথা বলেছেন। সাহিত্যের যে প্রচলিত মানদণ্ড ছিল তিনি সেটা পরিবর্তন ও নবায়নের কথা বলেছেন। শুধুমাত্র সুখ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি সাহিত্য রচনার বিরোধিতা করেছেন। তিনি সাহিত্যকে সমাজের কল্যাণের জন্য রচনার কথা বলেছেন। তিনি নিজে যেমন অনেক চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে লিখতেন, সাহিত্যিকদেরও তেমনি গবেষণার মাধ্যমে চিন্তা ভাবনা করে লিখতে বলেছেন।
আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে মিখাইল নু‘আইমা’র সাহিত্য সমালোচনার উপরে সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে মোট চারটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে মিখাইল নু‘আইমা’র বর্নাঢ্য জীবন, তার বাল্যকাল, নানা স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জন, বহুভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তার কর্মজীবন, লেখালেখিতে তার যুক্ত হওয়া, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তার রচনাবলি, বিভিন্ন বিষয়ে তার চিন্তাধারা, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষ সম্পর্কে তার চিন্তাকে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নু‘আইমা’র লেখার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, কবিতা ও গল্পে তার অবদান, কবিতার বৈশিষ্ট্য, কবিতার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র লিখন, জীবনী সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় তার অসামান্য অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য সমালোচনা কী, কীভাবে সাহিত্য সমালোচনা করতে হয়, একজন উত্তম সমালোচকের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস, আধুনিক যুগে

আরবী সাহিত্য সমালোচনা, সমকালীন আরবী সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সমালোচনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আরবী সাহিত্য সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমা'র অবদান, নু'আইমা'র নতুন ধারার সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যের মানদণ্ড, গদ্য ও পদ্য সাহিত্য সমালোচনা, কবিতার ভাষা ও ছন্দ কেমন হবে, 'গিরবাল'-এ নু'আইমা'র সমালোচনা এসকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
উপসংহারে গবেষণার সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে গবেষণার সঠিক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়েছে। বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণাপদ্ধতি প্রয়োগে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও গবেষণার কাজে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা ও তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতার কিছু বিষয় ছিল, তারপরও মিখাইল নু'আইমা'র মতো একজন প্রখ্যাত, আলোচিত সমালোচকের সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যদি কিছুটা হলেও জানতে পারে তাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।
মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন এটাই আমার প্রার্থনা।

গবেষক
তাছমিনা আফরোজ

প্রথম অধ্যায়

মিখাইল নু'আইমা'র জীবনী

প্রথম অধ্যায়

মিখাইল নু'আইমা'র জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বাল্যকাল

মিখাইল নু'আইমা ১৮৮৯ সালের ১৭ই অক্টোবর লেবাননের সর্বোচ্চ পর্বতগুলোর মধ্যে অন্যতম সান্নিন (Sannin) পর্বতের কাছে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম বাসকিনতা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাসকিনতা ছিলো ছোট্ট একটি পাহাড়ি গ্রাম। লেবাননের পাহাড় গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটি পাহাড়ের পাদদেশে বাসকিনতার অবস্থান। যা লেবাননের পূর্বদিকে, বৈরুত থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে এবং বাসকিনতা থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে "শুখরুব" নামক স্থানে তার জন্ম। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ থাকলেও তাদের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। তারা এক সম্প্রদায়ের মতো মিলেমিশে থাকতো।

তার বংশের পূর্বপুরুষের নামানুসারে তার নাম রাখা হয় মিখাইল নু'আইমা। যদিও তিনি ইংরেজীতে Mikhail Naimy নামে অধিক পরিচিতি। তার পিতার নাম ইউসুফ। মিখাইল শব্দের অর্থ যিনি ঈশ্বরের অনুরূপ। মিখাইল বলেছেন যে, তার দাদা তাকে হুরিয়াব নামে ডাকতেন।[১] তার পিতা মাতা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের ছিলেন।

তারা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন; চার ভাই ও এক বোন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। চারভাইয়ের নাম যথাক্রমে আদিব, হেইকাল, মিখাইল, নাজিব, নাসিব ও বোন গালিয়া। তার পরিবার ছিলো নয় সদস্য নিয়ে গঠিত। পাঁচ ভাই বোন, বাবা মা ও দাদা দাদী। তার দাদা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তার দাদা যখন আশি বছর বয়সে মারা যান তখন মিখাইল নু'আইমা'র বয়স ছিলো সাত বছরেরও কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তার দাদার মৃত্যু হয়। তিনি সেসময় প্রবাসে থাকার কারণে সে যুদ্ধ দেখে যেতে পারেননি।[২]

---

[১] মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, (বৈরুত : দারুল ইলম লিলামালাইন, ১৯৮৭ খ্রি.), প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৯

[২] প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৫-৪৪

তার পিতা ছিলেন দরিদ্র কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী কৃষক। তার পিতা তার পরিবারের উন্নতির আশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর তেমন ভালো কিছু করতে না পেরে আবার লেবাননে ফিরে আসেন। তার বাবা প্রবাসে থাকাকালীন তার মা মিখাইলের অন্য বড় দুই ভাইকে সাথে নিয়ে লেবাননেই ছিলেন। মিখাইলের মা প্রতিদিনই রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে তার স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন। এবং ছোট ছেলেকে মিখাইলকে বলতেন "আমার সাথে বলো, হে ঈশ্বর আমেরিকায় আমার বাবাকে সফলতা দিন। তার হাতের স্পর্শে বালি যেনো সোনায় রূপান্তরিত হয়।" সে সময় ছোট্ট মিখাইল তার চারপাশের বালি দেখে ভাবতে থাকে কেন তার বাবাকে আমেরিকার যেতে হবে বালিকে সোনায় রূপান্তরিত করার জন্য? আমেরিকার বালি কি এখানকার বালি থেকে আলাদা? হ্যাঁ, হয়তো এটাই হবে।[৩]

তার মা ছিলেন চরম ধৈর্য্যশীল ও বুদ্ধিমতী এক মহিলা। তিনি সংসারে অনেক অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও অনেক কষ্টে ধৈর্য্য সহকারে তার সন্তানদের লালন পালন করেন। নু'আইমা'র যখন মাত্র চৌদ্দ বছর তখন তার মা মারা যান।[৪] তার বাবা ছিলেন নিরক্ষর, দরিদ্র কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী এক কৃষক। তার পিতা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।[৫]

সেই কঠিন সময়ে বাসকিনতায় মায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তারা অনেক কষ্টকর জীবন যাপন করেন। তারা ছোট পাথর দিয়ে অতি সাধারণ ঘরে জীবনযাপন করতো। কিন্তু বাসকিনতায় সেই জলবায়ু, পাইন গাছের বন, গভীর উপত্যকা, গম ভুট্টার ক্ষেত, পাহাড় পর্বত, গাছ গাছালি, পাখির সুমিষ্ট সুরের গান ছোট্ট মিখাইল নু'আইমা'র হৃদয়ে গ্রামের প্রতি এক গভীর ভালোবাসার জন্ম দেয়। প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসাই মিখাইল নু'আইমা'র চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পায়। তিনি এই বিষয়গুলো তার বিখ্যাত আত্মজীবনী سبعون এ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।[৬]

৩.প্রাগুক্ত. পৃ. ১৫
৪.প্রাগুক্ত. পৃ. ৭৬৮
৫.প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৯
6. *Mikhail Naimy: Some aspects of his thought as revealed in his writing* (Dabbagh Hussein Muhammad Ali, January 1968) Pg-3

তার মা চেয়েছিলেন তার সন্তানেরা বাবার মতো লাঙ্গল, কোদাল না ধরে মানুষের মত মানুষ হোক। সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, দেশের মানুষের জন্য কিছু করুক। তার বাবা শুধু আমেরিকায় যাওয়া ছাড়া তাদের সংসারের উন্নতির জন্য তেমন কিছু করতে পারেননি। তাই ছয় বছর পর তার পিতা ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আবার লেবাননে ফিরে আসেন। তাই মিখাইল ও তার ভাই আদিব তখন আমেরিকাতে যান ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। তার মা ভেবেছিলেন তার ছেলেরা সংসারের উন্নতি সাধন করতে পারবে কারণ তাদের পিতা ছিলো অশিক্ষিত তাই কিছু করতে পারেননি। কিন্তু ছেলেরা শিক্ষিত তাই তারা অনেক ধরণের কাজ করতে পারবে।[৭]

মিখাইল নু'আইমা'র জীবনে তার সংসার জীবন অর্থাৎ বাবা-মার অনেক প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। নু'আইমা তার মা সম্পর্কে বলেন, "তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, অবিচল, উচ্চভিলাষী ও আবেগময়ী এক মমতাময়ী এক মানুষ। আর আমার বাবার ছিলো অভাবের যন্ত্রনা সহ্য করার মতো আশ্চর্য এক ক্ষমতা। যদি বাবা মার মধ্যে এ ধৈর্য্য ও একতা না থাকতো তাহলে আমাদের পরিবার ইস্পাতের পরমানুর মতো এত দৃঢ় সংহত হতো না।[৮]

---

[৭] ৭.মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত. পৃ. ৯৬

[৮] ৮.প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিখাইল নু‘আইমা’র শিক্ষাজীবন

নু‘আইমা’র বাল্যকাল বাসকিনতাতেই কাটে। শৈশব ও যৌবনের কিছুকাল তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। ১৯১১ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। নু‘আইমা’র দুই ভাই আদিব ও হেইকল “অর্থোডক্স চ্যারিটেবল স্কুলে” পড়াশোনা করেন। নু‘আইমা’র ভাইদের সাথে সেই স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন।[৯]

বাসকিনতায় রাশিয়ান স্কুলে ভর্তি (১৮৯৯-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ)

বাল্যকালে বাসকিনতায় এক রাশিয়ান প্রতিবেশীর মাধ্যমে নু‘আইমা’র জীবনের গতিপথে পরিবর্তন আসে। সেই রাশিয়ান প্রতিবেশী অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের সাহায্য করার জন্য লেবাননের ছোট্ট গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই মূলতঃ রাশিয়ান ও আরবি ভাষার চর্চা শুরু হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাসকিনতায় এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেটি বাসকিনতাতে বেশ ভালো মানের স্কুল ছিল। নু‘আইমা সে স্কুলে ভর্তি হন। তিনি এ স্কুল থেকে প্রথমে আরবী ভাষা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। মূলতঃ এ স্কুল থেকেই নু‘আইমা’র আরবী ভাষার সাথে সাথে রাশিয়ান ভাষার চর্চাও শুরু হয়। এই স্কুলে শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের জন্যও আলাদা ক্লাশ ছিলো। যেখানে ছেলে মেয়ে উভয়কেই শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেয়া হত। নু‘আইমা প্রাথমিক শিক্ষা এই স্কুল থেকেই পেয়েছিলেন। এবং এই স্কুলের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[১০] নু‘আইমা খুব উৎসাহের সাথে সেই স্কুলে পড়াশোনা করেন। নু‘আইমা তার আত্মজীবনী “সাবউনে” বলেন, “যদিও এই স্কুলের পড়া অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ছিলো। কিন্তু তাতে আমি সাহস হারাইনি।”[১১]

নু‘আইমা খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলেন। বন্ধু বান্ধবদের সাথে তার বন্ধুত্বও ছিল ভালো। অহেতুক ঝগড়া, সময় নষ্ট করা ইত্যাদি ছিল তার অপছন্দের। তিনি বলেন, “অকারণে চিৎকার

---

৯ .প্রাগুক্ত. পৃ. ২৬-২৭
১০.প্রাগুক্ত. পৃ.৭৬
১১ প্রাগুক্ত. পৃ. ৮১

চেচামেচি, ও ঝগড়া ছিল আমার অপছন্দের। আমি খেলার মাঠেও অল্প সময়ের জন্য থাকতাম। খেলার মাঠ ছেড়ে দূরে নির্জনে কোথাও বসে নীল আকাশ বা পাইন গাছের নিচে পিঁপড়ের লাইন ধরে চলা এগুলো দেখতেই আমার বেশি ভালো লাগতো।”[১২]

আরবী ভাষায় নু'আইমা'র দক্ষতা

আরবী ছিলো মিখাইল নু'আইমা'র প্রিয় বিষয়। তাই তিনি আরবী ভাষাকে ভালোভাবে রপ্ত করার জন্য, ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন নতুন অনেক শব্দ মুখস্থ করেন। তার চাচা ইব্রাহীমের লাইব্রেরীতে রাখা مجمع البحرين থেকে তিনি অনেক শব্দ মুখস্থ করেন। তিনি الامثال العربية اللغوية নামক গ্রন্থ থেকে অনেক শব্দ মুখস্থ করেন। পরে তার এক আত্মীয় মারা গেলে সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। বারো বছর বয়সী নু'আইমা'র বাগ্মীতা ও ভাষাগত দক্ষতা দেখে শ্রোতারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন।[১৩]

ফিলিস্তিনের নাজারাথের রাশিয়ান টিচার্স হাউসের পড়াশুনা (১৯০২-১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ)

পড়াশুনায় অত্যন্ত ভালো হওয়ার করণে মিখাইল নু'আইমা ১৯০২ সালে ফিলিস্তিনের নাজারাথের রাশিয়ান টিচার্স হাউসে পড়াশোনার জন্য একটি বৃত্তি লাভ করেন। এই স্কুলটি ফিলিস্তিনে রাশিয়ান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত ছিলো। যেখানে রাশিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনের সেরা ছাত্ররা পড়াশোনার সুযোগ পেত। নু'আইমা ছোটবেলা থেকেই তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। এখানেও তিনি তার মেধার স্বাক্ষর রাখেন। এখানে তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে ছয় বছর পড়ালেখা করেন। তিনি ছিলেন খুবই পরিশ্রমী। তিনি স্কুলেন নিয়মানুযায়ী সাফল্যের সাথে সবগুলো কোর্স সম্পন্ন করেন। এই চারটি বছর বাসকিনতাতে তার পরিবার খুব কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করেন। তার এক ভাই আদিব যিনি ওয়াশিংটনের ওয়ালা ওয়ালা নামক স্থানে থাকতেন, তার কাছ থেকে যে সামান্য অর্থ বছরে একবার বা দুইবার আসতো তাই দিয়েই তাদের জীবন চলতো।

---

[১২] প্রাগুক্ত. পৃ. ৮০-৮১
[১৩] প্রাগুক্ত. পৃ. ৭৬

নু'আইমা তার পরিবারের কষ্ট লাঘবের জন্য ভাবতে থাকেন কিভাবে পরিবারের জীবিকা ও মর্যাদা বাড়ানো যায়। কিন্তু তিনি এটাও ভালো করেই জানতেন যে, এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তিনি পড়াশোনায় আরো কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি এসময় রাশিয়ান ভাষাও রপ্ত করার চেষ্টা করেন। রাশিয়ান সাহিত্য অধ্যয়ন করা শুরু করেন। তিনি সেসময় কিছু উপন্যাস ও গল্প রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন। যেমনঃ জুলভার্ন রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বিখ্যাত রাশিয়ান সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের সাহিত্যে দ্বারা মুগ্ধ হন। এছাড়াও দস্তয়েভস্কিরও অনেক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। নু'আইমা'র অধ্যয়ন, কঠোর পরিশ্রম, মেধা ও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রাশিয়াতে সরকারি বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ পান। ১৯০৬ সালে তিনি রাশিয়ান ইউক্রেনের Poltova এ ভর্তি হন।[১৪]

রাশিয়ার পোল্টাভায় "সেমিনারি"তে অধ্যয়ন (১৯০৬-১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ)

"আসসিমনারি আররুহী" হলো একটি অর্থোডক্স প্রতিষ্ঠান। যা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের চেয়ে উপরের স্তরের একটি বিদ্যালয়। এখানে ছয় বছরের কোর্স ছিল। এটি ছিল এমন ধরণের বিদ্যালয় যেখানে রাশিয়ার প্রথম শ্রেণির অধিবাসীর সন্তানেরা, পাদ্রীর সন্তানরা পড়াশুনা করত।[১৫] ১৯০৬ সালে তিনি পোল্টাভার সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি রাশিয়ান ভাষায় সাহিত্য চর্চা এগিয়ে নিয়ে যান। এবং টলস্টয়ের চিন্তার সাথে তার চিন্তার মিল খুঁজে পান। তাই নু'আইমা বলেছিলেন, "টলস্টয় নিজের ও বিশ্বের প্রকৃত সত্যের সন্ধানে উৎসুক ব্যক্তি যা আমাকে তার দিকে উৎসাহী করেছে।"[১৬]

১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে পড়াশুনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বিখ্যাত রাশিয়ান সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের এর সাহিত্য দ্বারা মুগ্ধ হয়ে বলেন,

---

১৪. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস* (বৈরুত, দায় আল জিল, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৩৬৯, মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

১৫. নিকোলাই গোপাল, *রচনাসপ্তক* (মস্কোঃ রাগুদা প্রকাশন ১৯৮৭) পৃ. ৪১১

১৬.মিখাইল নু'আইমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-২৭৪

لقد استهواني تولستوي المفتش عن حقيقة نفسه وحقيقة العالم . فأنا كذلك كنت قد بدأت أقتش بمنتهي الجد عن حقيقة نفسي و حقيقة العالم الذي أعيش فيه - والمصباح الوحيد الذي كنت أهتدي بنوره هو المصباح الذي سار على نوره تولستوي وأعنى الإنجيل-[১৭]

“পৃথিবী ও স্বীয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উদঘটনে টলস্টয় আমাকে মুগ্ধ করেছেন। তাই আমিও স্বীয় আত্মা ও এ ধরার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে নিবেদন করি। যে ধারার বুকে আমি বাস করি এক্ষেত্রে আমি ঐ প্রদীপের আলো অনুসরন করি যা হুবুহু টলস্টয়ের অনুসৃত [১৮]আলো অর্থাৎ ইঞ্জিল।”

Poltova তে অধ্যয়নকালে তিনি রাশিয়ান ভাষা এতটাই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন যে, সেসময় তিনি রাশিয়ান ভাষায় কবিতাও রচনা করেন। সেই সময়েই তিনি বিখ্যাত কবিতা النهر المتجمد The Frozen River রচনা করেন।[১৯] পরবর্তীতে আরবী ভাষাতেও এ কবিতা অনুদিত হয়।

আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী প্রাপ্তি : (১৯১২-১৯১৬ খ্রি.)

১৯১১ সালের নভেম্বরের প্রথমদিকে মিখাইল তার ভাইয়ের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে তিনি University of Washington এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন শুরু করেন। এই ইংরেজী ভাষা চর্চাই পরবর্তীতে আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভর্তির পথ সহজ করে দেয়। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন ও সাহিত্য বিষয়ে ভর্তি হন।

---

১৭. মীখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭১।

১৮. নেছার উদ্দিন আহমদ, *প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, অভিসন্দর্ভ ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। পৃ .২৬৫

১৯. মুহাম্মদ আবদুল গনী হাসান, *আল শির আর আরবী ফিল মাহজার*, (কুয়েতঃ দার আল কলম , ১৯৭৬খৃ.) পৃ. ১৫৭

১৯১৬ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা ও আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এই ডিগ্রী অর্জন করতে তার ছয় বছর সময় লেগেছিল। কারণ সেখানে নিয়ম ছিলো কলেজ অফ আর্টসের জন্য চার বছর এবং আইন প্রোগ্রামের জন্য তিন বছর সময়। কিন্তু কেউ যদি দুটি ডিগ্রী একসাথে নিতে চায় তবে সাত বছরের পরিবর্তে ছয় বছরে এই কোর্স সম্পন্ন করতে পারবে। তিনি এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আইন ও কলা এই দুটি কোর্স একসাথে সম্পন্ন করেন।[২০]

---

[২০] ২০. মুহাম্মদ নুর-অর-রশীদ, মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ. ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নু'আইমা'র কর্মজীবন

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে নু'আইমা আমেরিকার "ওয়ালা ওয়ালা" নামক স্থানে ফিরে আসেন। যেখানে তার দুই ভাই আদিব ও হায়কাল ছিল। তিনি সেখানে প্রথমেই কর্ম জীবনে প্রবেশ না করে, পড়াশোনা সব বাদ দিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চান। কিন্তু সেখানে তিনি বিশ্রামের পরিবর্তে তিন সপ্তাহের মধ্যে 'ফাদারস এন্ড সন্স' নামে একটি নাটক রচনা করেন। তিনি এটিকে রাশিয়ান লেখক তুর্গেনেভের একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নামে শিরোনাম দেন।[২১]

নিউইয়র্কে কর্মজীবন

১৯১৬ সালে নু'আইমা আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। সেখানে শিল্পী সাহিত্যিকরা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। নিউইয়র্কে আসার কয়েকদিন পর তিনি সেখানে একটি রাশিয়ান বাণিজ্যতরীতে একটি চাকরি পান। মাসিক আশি ডলারের বিনিময়ে তিনি এ চাকরিতে নিয়োগ দেন। কিন্তু দুইমাস পর তার বেতন একশত ডলার করা হয়।[২২] বেশ কয়েক মাস পর তিনি "বেথেলহেম স্টিল কোং" নামে রাশিয়ান কোম্পানির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তখন তার বেতন হয় ১৫০ ডলার, এই কোম্পানির সদর দপ্তর ও কর্মক্ষেত্র ছিল পেনসিলাভানিয়ার একটি ছোট শহর "বেথেলহেমে"।[২৩]

নিউইয়র্ক ছেড়ে তার নতুন কর্মক্ষেত্র পেনসিলভানিয়ার ছোট্ট শহর বেথেলহেমে যাওয়ার আগে তিনি রাশিয়ান কবিতা "দ্য ফ্রোজেন রিভার" আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। যেটি "আল ফুনুন" ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যিকরা বলেছিলেন, এটি আরবী কবিতার একটি সূচনা। এমনকি জিবরানও এই কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তিনি বলেন, এই কবিতাটিতে আমার চিন্তার সাথে তার চিন্তার মিলের প্রকাশ ঘটেছে। সুর ও ছন্দে কবিতাটি সাহসিকতায় পূর্ণ একটি কবিতা। এই কবিতার একটি লাইন আরেকটি লাইন ছাড়া অসম্পূর্ণ।

---

২১. মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯, হান্না আল ফাখুরী, *আল জামী ফি তারিখিল আদাব আল আরবী আল আদাব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৬৯

২৩. মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

এই কবিতাটি তেমনই হয়েছে যেমন আমি কবিতা রচনা করি।[২৪]

এরপর তিনি "আখি" (আমার ভাই) কবিতাটি রচনা করেন নাসিব আরিদার অনুরোধে তিনি এটি ব্রুকলিন সম্প্রদায় দ্বারা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন। এবং সেখানেও এই কবিতার জন্য তিনি ব্যাপকভাবে প্রশংশিত হন। যারা কবিতার নবায়নে উৎসাহী তাদের জন্য এ কবিতা ছিল একটি মাইলফলক।[২৫]

আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগদান

১৯১৭ সালের ৪ জুন, আমেরিকা জার্মানির বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেই সময় নু'আইমা'র কাছাকাছি একটি বিভাগে তার নাম নিবন্ধন করা হয়। একুশ থেকে বত্রিশ বছরের সকল যুবকের নামই সেই নিবন্ধনে যুক্ত করা হয়। তার নাম নথিভুক্ত হওয়ার পরও আবার তার নাম নথি থেকে ছয় মাসের জন্য বাদ দেয়া হয়। কারণ তিনি একটি মিত্র দেশের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। দ্বিতীয় বারও ছয় মাসের জন্য তাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় মিত্র দেশের কাজ শেষ করার জন্য।

এরপর তিনি ১৯১৮ সালের মে মাসে আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসি ফন্টে পাঠানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান সরকারের কাছ থেকে ফরাসি ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য ফ্রান্সের রেনেস (Rennes) বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃত্তি পান। রেনেস বিশ্ববিদ্যায়টি ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রেটাগন (Bretagne) নামক স্থানে অবস্থিত। এরপর তিনি ১৯১৯ সালে নিউইয়র্কেও ওয়ালা ওয়ালা নামক স্থানে আবার ফিরে আসেন। যেখানে তার দুই ভাই ছিল। সেখান আসার পর নাসিব আরীদাহ্ ও জিবরানের অনুরোধে "আল ফুনুন" পত্রিকায় পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আরব সাহিত্যিক প্রেসে কাজ শুরু করেন।[২৬]

---

২৪. মুহাম্মদ নুরু অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ. ৪৫

২৫. মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন* ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৫১

২৬. মুহাম্মদ নুরু অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ. ৪৬

তিনি নিউইয়র্কে অবস্থানকালেই তার বন্ধু খলীল জিবরানের সাথে মিলে আরবী সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা করেন।

আরব লেখক সংঘে অংশগ্রহণ

মিখাইল নু'আইমা আমেরিকাতে অধ্যয়নকালে ১৯১৩ সালে আমেরিকা থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত الفنون(Arts) নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হাতে পান। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফিলিস্তিনে আল Nazarath এ অধ্যয়নকালে তার বন্ধু "নাসীব আরীদাহ"। এ পত্রিকায় জিবরান খলীল জিবরান, আমীন আল রায়হানী ও নাসীব আরীদাহও লেখালেখি করতেন।[২৭] এ সময় তিনি প্রবাসে আরবী সাহিত্য চর্চা নিয়ে অনেক কাজ করেন।

এই পত্রিকার মাধ্যমে অনেক লেখকদের সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। জিবরান খলীল জিবরান ও অন্যান্য লেখকদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পর তারা সকলে মিলে তাদের মাতৃভাষা নিয়ে কাজ করার চিন্তা করেন। কীভাবে তাদের মাতৃভাষার আরো উন্নতি ও কল্যাণ করা যায়, সেলক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। আমেরিকাতে কবি সাহিত্যিকদের সাথে লেখালেখির এক পর্যায়ে তিনি তার জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরইমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তাকে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের জন্য বলা হয়। তিনি আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় The University of Rennes এ ফরাসী সাহিত্য ও ফ্রান্সের ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন।[২৮]

১৯২০ সালে তিনি আমেরিকা শহরে প্রবাসীদের দ্বারা গঠিত Pen Association (الرابطة القلمية) বা আরব লেখক সংঘের তিনি উপদেষ্টা নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি এ সংঘের

---

২৭. ড. নাদিরা জামিল আল সাররাজ, *ছালাছাতু রুয়্যাদ মিনাল মাহজার* (কায়রোঃ দার আল মা'আরিফ ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৮২
২৮. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮৩, হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস* (বৈরুত ঃ দায় আল জিল, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৩৬৯

নীতিমালা ও প্রণয়ন করেন। তিনি এ সংগঠনের প্রচার, প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। এবং এ সংগঠন থেকেই পরবর্তীতে শুরু হয় প্রবাসে আরবী সাহিত্য চর্চা । এ ভাবেই তিনি প্রবাসে থেকেও আরবী সাহিত্য প্রচার ও প্রসারে অনেক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন।[২৯]

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাথে সাক্ষাৎ :

১৯২১ সালে হোয়াইট হাউসে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাথে মিখাইল নু'আইমা'র সাক্ষাৎ হয়। সেখানে সিরিয়া ও অন্যান্য দরিদ্র দেশের জন্য কাজ করায় তাকে বিশেষ পুরষ্কার দেয়া হয়। তখন নু'আইমা'র সাথে ছিলেন নাসীব আরীদাহ, আবদ আল-মাসীহ হাদ্দাদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।[৩০]

কোম্পানীতে চাকরী :

মিখাইল নু'আইমা তিন লেবানিজ ভাইয়ের জন্য ও তার জন্য ড. আইয়ুব সাবেতের মাধ্যমে একটি কোম্পানীতে যোগদান করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করেন। প্রথম দুই বছর সেখানে বেতন ছিল মাসে একশত ডলার। তৃতীয় বছর দুইশত ডলার, চতুর্থ বছর চারশত ডলার ও পঞ্চাম বছরে বেতন পাঁচশত ডলারে উন্নীত হয়।[৩১]

নু'আইমা'র জীবনে প্রেম, ভালোবাসা :

কোম্পানীতে চাকুরী করার সময় ম্যানহাটন দ্বীপে এক মহিলার ঘরে ছয় ডলারের বিনিময়ে ভাড়া থাকতেন। সেই মহিলার নাম ছিল "বেলা" যার কোন সন্তান ছিলো না। তার স্বামী যার নাম ছিল "হারা" সে ছিলো মাদকাসক্ত। তিনি সবসময় স্বামীর ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কখনো কখনো তিনি তার স্বামীর অনুপস্থিতে মিখাইলকে ডিনারে আমন্ত্রন জানান এবং তাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হয়। এই সম্পর্ক তাদের মধ্যে পাঁচ বছর ছিলো। এই সম্পর্কের কারণেই তিনি অনেক কবিতা

---

২৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ৯০

৩০. মীখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৫৫

৩১. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪২৩

লিখতে অনুপ্রানিত হয়েছেন। এরমধ্যে রয়েছে “হামছ আল জুফুন” এ লিখিত “আফাফ আল কলব” কবিতাটি। যেখানে তিনি তার চিন্তাভাবনা এবং হৃদয়ের মাঝে তার দ্বন্ধ চিত্রিত করেছেন। তিনি তার কল্পনা, চিন্তাধারা সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন। হে আমার আত্মা, তুমি কে? তিনি সবকিছুতে তাকে দেখেন এবং তার মধ্যে সবকিছু দেখেন। শেষে তিনি বলেন ঈশ্বর এক, তিনিও এক। সবশেষে তিনি এটা বলেন যে, তার আত্মা ঈশ্বরের একটি অংশ। তিনি তার জীবনের সমস্যার প্রতিচ্ছবির এমনভাবে সমাপ্তি ঘটান যেন তার সমস্ত ইচ্ছা আত্মাকে অসাড় করে দেয়। তখন তিনি তার “হাবলি আততামান্নায়ী”(ইচ্ছার দড়ি) কবিতায় বলেন :

غير أني , وإن كرهت التمني
أتمني لو كنت لا أتمني[32]

“তবে আমি ইচ্ছা করে ঘৃণা করলেও
আমি আর ঘৃণার ইচ্ছা (পোষণ) করতে চাই না।”

১৯২৫ সালের শেষের দিকে নিউইয়র্কে চীনা, ভারতীয়, পার্সিয়ান, সিরিয়ানদের নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনের জন্য তার তিন ভাইয়ের সাথে সেই চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর তিনি সেখানে চাকুরি ছাড়াই থেকে যান। পরবর্তীতে সেখানে “এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা” যেখানে ছাপা হয়েছিল সেখানে কাজ করেন।

এরপর তিনি সেখান থেকেই টাইমস ও “দ্য এন্ডলেস রেস” (The Endless Race) নামে প্রথম ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এসময় তিনি কিছুটা আধ্যাত্মিক কল্পনার জগতে প্রবেশ করেন, তাই নির্জনে চিন্তা ভাবনা করার জন্য ১৯২৮ সালে “ওয়ালা ওয়ালা” তে ফিরে যান।[৩৩]

---

৩২. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৩৩-৪৪
৩৩. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৬৫-৬৭

ওয়ালা ওয়ালাতে ফিরে আসার পর তিনি পাহাড় দ্বারা নির্জন সবুজ উপত্যাকায় নদীর তীরে একটি কাঠের বাড়িতে প্রকৃতির সাথে কয়েকদিন একাই বসবাস করেন। যে জায়গাটি ছিলো ওয়ালা ওয়ালা থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল দূরে। এসময় তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন, সাথে সাথে ইংরেজী কবিতাও লেখেন।

এরপর তিনি নিউইয়র্কে ফিরে আসেন এবং একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অফিসে কাজ করেন। তাদের চীনে আমদানি রপ্তানির বড় ব্যবসা ছিলো। সেসময় তিনি 'নিয়োনিয়া' নামক আরেক সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়েন। তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিলো ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে সে সম্পর্কও আর স্থায়ী হয়নি।[৩৪]

আমেরিকাতে থাকাকালীন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি দুই মহিলার প্রেমে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি তাদের থেকে দূরে নির্জনে জীবন যাপন করেন। যা তার Autobiography তে প্রভাব ফেলে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি পূর্ন মানসিক প্রশান্তি নিয়েই সে সম্পর্ক শেষ করেন। এই দুই ঘটনার পর তিনি আমেরিকা ত্যাগ করার চেষ্টা করেন। তখন তার বয়স মাত্র ৪৩ বছর। মূলত এই দুই মহিলার কাছ থেকেই তিনি জগত সম্পর্কে অনেক বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন । পরবর্তীতে তিনি ১৯৩২ সালে তিনি আবার লেবাননের বাসকিনতাতে ফিরে যান এবং জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন। তিনি বলেন, "Lust had no power over my body" "আমার শরীরের উপর লালসার কোনো শক্তি নেই"। শুধুমাত্র শক্তি এবং ইচ্ছাই কোনো পুরুষ বা মহিলাকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এবং সমস্ত চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারে। নু'আইমা তার আত্মজীবনীতে সর্বেশ্বরবাদের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়েছেন।[৩৫]

---

৩৪. প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৬৭

৩৫. মীখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৩৩-৪৪,৫৬৭

লেবাননে প্রত্যাবর্তন :

১৯৩১ সালে জিবরান খলিল জিবরানের মৃত্যুর পর মিখাইল নু'আইমা লেবাননে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। **১৯৩২** সালে লেবাননে ফিরে আসেন। বাকী জীবন তিনি লেবাননেই কাটিয়ে দেন।[৩৬] **১৯৫৬** সালে তিনি আল কিতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়নে সফর করেন।[৩৭]

এরপর নু'আইমা লেবাননের শাখরুবে অনেকটা নির্জন বসবাস করতে থাকেন। তিনি জিবরানের মতো সাহিত্যেও নানা বিষয় নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি মানুষের কোলাহল থেকে দূরে বাসকিনতার এক নির্জন গুহায় বসে চিন্তাভাবনা করতেন। এ সময় তিনি জ্যেতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও চিন্তা করেন। সেখান থেকে নু'আইমা'র কিছু অনুসারী তৈরি হয়। যারা নু'আইমা'র চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতো। এভাবে তার অনেক ভক্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।[৩৮]

মিখাইল নু'আইমা'র ব্যক্তিগত গুণাবলি :

নু'আইমা ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, বহুভাষাবিদ, ক্ষুরধার লেখক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। প্রখ্যাত প্রফেসর ও আইনজীবি كعدي فرهود كعدي নু'আইমা'র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেন,[৩৯]

أتقن (ميخائيل نعيمة) العربية والروسية والإنكليزية , وألم ألماما كافيا بالفرسية , فكان له هذه اللغات مفاتيح لخزائن أدب الغرب الشرق التي كنز من كنوزها ما جعل القلم واللسان له قيادهما, فهو فصيح اللسان , سيال القلم , واسع الاطلام عميق الكفر , بعيد الخيال , ثبت الجنان , صلب الرأى حتى العناد, حريص على شخصيته أن تمس ولو بكلمة أو إشارة ......لا يجابي ولا بوارب ولا لداجى .... بعيد على الزلفى والمجاملة[39]-

---

[৩৬] .হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস* (বৈরুতঃ দায় আল জিয়াল, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৩৬৯
[৩৭] . মীখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৮২৬
[৩৮] .হান্না আল ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০ ,৩৬৯
[৩৯] . কায়াদী ফারহাদ কায়াদী , *মীখাইল নু'আইমা বাইনা কারিইহী ওয়া আরিফীহী*, (বৈরুত ঃ ১৯৭১ খ্রি.) পৃ. ২২-২৩

“মিখাইল নু’আইমা রাশিয়ান, আরবী এবং ইংরেজি ভাষায় ভালো দক্ষতা রাখতেন। ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে তার ভালো জানা ছিলো। ভাষার এ জ্ঞান ও দক্ষতার কারণেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য ভাণ্ডারের চাবিস্বরূপ ছিলেন। যা তার কলম ও কাগজকে এ দু’সাহিত্যের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সাবলীল করে তুলেছিলো। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ভাষী, ক্ষুরধার লেখক, পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, দূরদর্শী, দৃঢ় মননের অধিকারী দৃঢ় সিদ্ধান্তের অধিকারী, এমনকি একগুয়েমী, স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপর একটি মাত্র বাক্য কিংবা সামন্য ইঙ্গিত দ্বারা হোকনা কেন, স্পর্শ করার প্রতি উৎসাহী। তিনি কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না, প্রতারণা করা বা ধোঁকাও দিতেন না। মর্যাদা ও সৌজন্যতা প্রকাশ থেকে দূরে ছিলেন।”[৪০]

সাহিত্য চর্চার প্রতি তার প্রবল আগ্রহের কারণেই তিনি লেবানন থেকে ফিরে জিবরানের মতো সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সহিত্য চর্চার জন্য তিনি তার জন্মস্থান বাসকিনতার কাছাকাছি ‘শুখরুব’ নামক স্থানে এবং ‘ফুলক’ নামক আরেক জায়গায় সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

‘শুখরুবে’ থাকার কারণে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক তাওফীক ইউসুফ আওয়াদ নু’আইমাকে ناسك الشخروب (The Hermit Skakhrub) উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু তিনি সেখানে অন্য কোনো ধ্যান না করে সাহিত্য চর্চার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করতেন। মানুষের প্রয়োজনে সাড়া দিতেন, কারো সমস্যা হলে সমাধান করে দিতেন। এভাবেই তিনি সাহিত্য চর্চ্যার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজও করতেন।[৪১]

---

৪০. নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
৪১. ড. নাদিরা জামিল আল সাররাজ, *ছালাছাতু রুয়্যাদ মিনাল মাহজার* (কায়রো: দার আল মা’আরিফ ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৯০, হান্না আল ফাখুরী আল জামে. পৃ- ৩৭১

রচনাবলি :

মিখাইল নু'আইমা বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কাব্যগ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ, ছোটগল্প, আত্মজীবনী, জীবনচরিত ও ইতিহাস, প্রবাদ প্রবচনমূলক গ্রন্থ, ইংরেজী গ্রন্থ, অনুবাদমূলক গ্রন্থ। এছাড়াও নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তার রচিত বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলোঃ

১. প্রবন্ধ :

*صوت العالم (বিশ্বের কণ্ঠ) ১৯৪৮ খ্রি. কায়রো থেকে প্রকাশিত।

* النور والديجور (আলো ও আঁধার) ১৯৫০ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* زاد المعاد (পরকালের পাথেয়) ১৯৩৬ খ্রি. কায়রো থেকে প্রকাশিত।

* البيادر (শস্য মাড়াইয়র স্থান) ১৯৪৫ খ্রি. কায়রো থেকে প্রকাশিত।

* الأوثان(প্রতিমা) ১৯৪৬ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

*فى مهب الريح (বায়ু প্রবাহে) ১৯৫৩ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* دورب(গিরিপথ) ১৯৫৪ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

*أبعد من موسكو ومن واشنطن (মস্কো ও ওয়াশিংটন থেকে দূরে) ১৯৫৭ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।[৪২]

*المراحل (স্তরসমূহ) ১৯২৩ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

এছাড়াও তার আরও নানা ধরনের প্রবন্ধ রয়েছে।

২. নাটক :

* الأباء والبنون (পিতা-পুত্র) ১৯৭১ খ্রি. নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত।

*الورقة الأخيرة وأيوب (শেষ পাতা ও আয়্যুব) ১৯৬৭ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

---

[৪২] হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত. পৃ- ৩৭১

৩. গল্প :

*لقاء (সাক্ষাত) ১৯৪৮ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* هوامش (টীকা টিপ্পনি) ১৯৬৫ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* أكابر (মহৎ লোক) ১৯৫৬ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* مذكرات الارقش (আরকাশের ডায়েরী) ১৯৪৯ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* اليوم الأخير (পরকাল) ১৯৬৩ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* يا إبن آدم (হে আদম সন্তান) ১৯৬৯ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* كان ما كان (যা হওয়ার হয়েছে) ১৯৩৭ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* أبو بطة (আবু বাত্তা) ১৯৫৮ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

৪. সাহিত্য সমালোচনা :

*الغربال(চালুনি) ১৯২৩ খ্রি. কায়রো থেকে প্রকাশিত।

* في الغربال الجديد (নতুন চালুনিতে) ১৯৭২ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

৫. প্রবাদ প্রবচন : *كرم على درب (গিরিপথে উদারতা) ১৯৪৬ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

৬. পত্র যোগাযোগ : *رسائل (পত্রসমূহ) ১৯৭৫ খ্রি.বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

৭. জীবন চরিত্র ও ইতিহাস : * جبران خليل جبران (জিবরান খলিল জবিরান: জীবন চরিত্র) ১৯৩৪ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* سبعون ج 1 (সত্তর প্রথম খণ্ড) ১৯৫৯ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

* سبعون ج2, ج3 (সত্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) ১৯৬০ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত। (এই তিনটি গ্রন্থ তার জীবন ইতিহাস)।[৪৩]

---

[৪৩] ৪৩.হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস*, . প্রাগুক্ত. পৃ- ৩৭১,২৭৪-৭৫

৮**. কাব্যগ্রন্থ :** *همس الجفون (চোখের পাতার ক্ষীন আওয়াজ) ১৯৪৫ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

৯**. গবেষনা মূলক গ্রন্থ :** *من وحي المسيح (ঈসা মাসীহর ঐশী বাণী হতে) ১৯৭৪ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

ইংরেজী গ্রন্থ : * The book of Mirdad. ১৯৪৮ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

*Memorires of vagrant Soul. ১৯৫২ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

*Gibran Khalil Gibran His life and his warks .১৯৫০ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

*Till We meet and twelve other Stories. ১৯৫৭ খ্রি. বোম্বাই থেকে প্রকাশিত।

অনুবাদ গ্রন্থ :

* The Frozen River নামক রাশিয়ান ভাষায় লিখিত النهر المتجمد নামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

* জিবরান খলিল জিবরান চরিত্র The prophet নামক বইটি তিনি النبيনামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন, যা বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

* The book of Mirdad, ইংরেজী ভাষায় লিখিত তার এ গ্রন্থটির ও كتاب مردادনামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন, বৈরুত থেকে এ বইটি ১৯৫২ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি সম্পর্কে নু'আইমা বলেন, "পৃথিবীতেক অজস্র বই রয়েছে কিন্তু The Book of Mirdad এর অবস্থান যেকোনো বইয়ের উপরে।"

The book of Mirdad বইটি একটি মঠ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক বই ছিল। যেখানে বন্যা কমে যাওয়ার পর নুহের জাহাজ বিশ্রাম নিয়েছিল। এটি মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা করে। Mystic Osho এই বইটি সম্পর্কে বলেন, "এটি একটি ছোট বই, কিন্তু যে মানুষটি এই বইটির রচনা করেছেন সে অজানা কেউ নয়, যেহেতু তিনি

একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি আর কখনও লেখেননি, শুধু সেই একক বইটিতে তার পুরো অভিজ্ঞতা রয়েছে। লোকটির নাম ছিল মিখাইল নু'আইমা।"

এ ছাড়াও তার আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যেমন :

زاد المعاد

ومضات(شذور وأمثال), ১৯৭৭ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

أحاديث مع الصحافة, ১৯৭৩ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

نجوي الغروب ,১৯৭৩ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

মিখাইল নু'আইমা রচিত সকল রচনাবলী المجموعة الكلالمة নামে ১৯৭৯ ও ১৯৮১ এর মধ্যে নয় খণ্ডে লেবাননের বৈরুতস্থ دار العلم للملايين প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশ করা হয় পরবর্তীতে ১৯৮৬ খ্রি. উক্ত সংস্থা কর্তৃক এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪৪]

মৃত্যু :

এই মহান সমালোচক, বহুভাষাবিদ, দূরদর্শী, ক্ষুরধার ও চিন্তাশীল লেখক, বিখ্যাত কবি ও বিশুদ্ধ ভাষী মহান ব্যক্তি ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সালে লেবাননের বৈরুতে ইন্তেকাল করনে।[৪৫]

---

৪৪. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৭১

৪৫.https://www.google.com/search?q=mikhail+Nuaima&oq=mikhail+Nuaima

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিখাইল নু'আইমা'র চিন্তাধারা

মিখাইল নু'আইমা'র ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারায় রয়েছে গভীর ধর্মীয় অনুভূতি। যদিও তিনি একজন অর্থোডক্স খ্রিষ্টান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। এখানে তার চিন্তাধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সৃষ্টিকর্তা :

মিখাইল নু'আইমা ছিলেন একজন আস্তিক মানুষ। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তিনি দার্শনিক, পদার্থবিদের মতো করে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। তাই কখনো কখনো তাকে আমরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী আবার কখনো কখনো তাকে অস্থির সংশয়বাদী হিসেবে দেখি।

মিখাইল নু'আইমা প্রকৃতপক্ষেই আস্তিক ছিলেন। যার প্রমাণ আমরা তার বিভিন্ন লেখায় দেখতে পাই। যেমন তার রচিত "আবু বাত্তাহ" (ابو بطة)[৪৬] বইয়ের New Birth" (ميلاد جديد) নামক গল্পে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলের মা ক্রিসমাসের পূর্বে খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করতে বলে তাকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য। সে সময় একজন চোর ছেলেটির ঘরে ঢুকলে ছেলেটি তাকে যিশুখ্রীষ্ট মনে করে তার কাছে আরোগ্য কামনা করে। চোরটি ছেলেটির জন্য করুণা বোধ করে এবং তাকে তার হাত ধরে হাটতে বলে। তখন বেথলেহেমের ঘন্টা বাজলে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ছেলেটির হাটতে সক্ষম হয়। এই গল্পটি দ্বারা মিখাইল নু'আইমা কতটা আস্তিক ছিলেন তা বুঝা যায়। আমরা তার সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস দেখতে পাই এবং তিনি পূণ্য ও পবিত্র পথে চলার চেষ্টা করতেন এবং তিনি আল্লাহর সাথে একাত্মতা ও আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়াও অর্জন করেন।[৪৭]

এমনিভাবে নু'আইমা'র অন্তরে বিভিন্ন আদর্শের যথা প্লেটো, সুফিবাদী ও আধুনিক গ্রীক দর্শনের কিছু প্রভাব থাকলেও সৃষ্টিকর্তার উপর তার সত্যিকারের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

---

৪৬. মিখাইল নু'আইমা, "আবু বাত্তাহ" (ابو بطة), (বৈরুত : ১৯৫৮ খ্রি.)পৃ. ১৭৪-১৮১

৪৭. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস* , প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৬৯

সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত অবস্থা

মিখাইল নু'আইমা'র মতে সৃষ্টিকর্তা অবিনশ্বর। তাঁকে নানা নামে ডাকা যায়। বিভিন্ন নাম বলতে নু'আইমা সৃষ্টিকর্তার মৌলিকতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দর্শন বুঝাতে চেয়েছেন। তার মতে, আল্লাহ হলেন রূহ বা রহস্য। এ রহস্য উদঘাটনে অনেক সময় প্রয়োজন। খুব সহজে এ রহস্য উদঘাটন সম্ভব নয়। তাই তিনি পুনর্জন্মে বা দেহান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কখনো এই সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তিনি নানা ধরণের মন্তব্য করেন যাতে তার বিশ্বাসের অন্য ধারা প্রকাশ পায়। তিনি তার مرداد নামক গ্রন্থে বলেছেন, "শোনো! ইলাহ এবং মানুষ বলতে কিছু নেই বরং মানব মাবুদ এবং মাবুদ মানব আছে। একই জিনিস যা খুব কমই পৃথক হয় বরং একক সত্তা হিসাবে সর্বদা বিদ্যমান থাকে।[৪৮] তার পরকাল নামক গ্রন্থেও তিনি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে নানা মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তায় তার অবিচল বিশ্বাস ছিল।

মানুষ :

মিখাইল নু'আইমা'র মানুষ সম্পর্কে অভিমত খুব স্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে তার মতামত দোদুল্যমান। তার দৃষ্টিতে দেহান্তর ও পুন:জন্মের মধ্যেই মানুষের সৃষ্টি।[৪৯] মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে প্রায়ই তিনি ঈসা মসীহ ও পবিত্র ইঞ্জীলের শরণাপন্ন হয়েছেন। খ্রিস্টানরা মনে করেন ঈসা আল্লাহর পুত্র। মিখাইল নু'আইমা'র মতামত হল সকল মানুষই আল্লাহর পুত্র। এসময় তিনি কিছু ভ্রান্ত সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে।

আবার মিখাইল নু'আইমা প্রাচীন মিশরীয়দের মতো মানুষের অমরত্বেও বিশ্বাস করতেন। প্রাচীন মিশরীয়রা মৃত্যুকে শুধু মাত্র প্রস্থান ভাবত এবং মানুষের পুন:জন্মে বিশ্বাসী ছিল। মিখাইল নু'আইার আত্মার স্থানান্তরের বিষয়টি আরো শক্তিশালী করে আরবের 'আল আনকা' (العنقاء) পারশিয়ানদের সিমর্গ (Simorg) ভারতীয়দের ঘারুদা (Gharuda) এবং জাপানিদের হুওও (hu oo) পৌরনিক মতবাদ।

৪৮.প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৮১

৪৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৮১

মিখাইল নু'আইমা রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে দীর্ঘদিন অবস্থান করার ফলে তাদের চিন্তাধারা তার মাঝেও প্রভাব ফেলে। তিনি রাশিয়ানদের সাথে এতটাই মিশে গিয়েছিলেন যে তিনি নিজেকে তাদেরই একজন ভাবতেন। রাশিয়ানদের ইতিহাস ঐতিহ্য সব তার ভালোভাবে জানা ছিলো। রাশিয়ান সাহিত্যে তার বিস্তর জ্ঞান ছিল। যার কারণে মানুষের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তার মধ্যে রাশিয়ান দার্শনিকের প্রভাব পাওয়া যায়। তিনি সেসময় টলস্টয়ের মতবাদ দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৫০]

মিখাইল নু'আইমা'র দৃষ্টিতে পুণর্জন্মবাদ বা দেহান্তর :

মিখাইল নু'আইমা'র মতে সৃষ্টির শুরুতে প্রথম মানব হযরত আদম (আ) কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন একা। পরবর্তীতে তার বাম পাজরের হাঁড় থেকে তাঁর বিপরীত লিঙ্গ পৃথিবীর প্রথম মানবী হযরত হাওয়া কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা উভয়েই আল্লাহর মতো হওয়ার জন্য শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন। আর এ জিনিসই সকল মানুষকে প্রলুব্ধ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১৯১৬ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও সাহিত্য দুটি বিষয়ে ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি থিউসোফিয়া মতবাদের সংগঠনে যোগ দিয়ে তার মতবাদ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দেহান্তর পুনরুজ্জীবনের মূলনীতি, শক্তির উৎস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। এ সময় তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ الأباء والبنون ا(পিতা ও পুত্র) রচনা করনে। যাতে তিনি আবর প্রাচ্যে প্রচলিত সামাজিক নীতির বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন।

তিনি ছিলেন পুণর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তার দেয়া এক বক্তব্যে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। যে বক্তব্য তিনি ১৯৭৪ খ্রি. প্রাচ্য ইনিস্টিটিউটের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ইয়াসুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন দেহান্তর সম্পর্কে। দেহান্তর বা পুণর্জন্মবাদ সম্পর্কে তাকে সেখানে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ মতবাদ গ্রহণ করার পূর্বে তার আত্মিক কষ্ট ও যন্ত্রনা ভোগ করতেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

---

50. Hussain Muhammad Ali Dabbag, *Mikhail Naimy: Some aspects of his thought as revealed in his writing*,(Durham University: January 1968)pg-102

ভালো বা মন্দ বললে তিনি কষ্ট পেতেন। একবার জিদ্দায় গিয়ে যখন শুনতে পেলেন খারাপ বা মন্দ কাজ প্রকাশ সৃষ্টির প্রথম মানব আদম হাওয়া থেকে প্রকাশ পায় কারণ তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। এরপর তার মনে কিছুটা হলেও প্রশান্তি আসে।[৫১]

এ সম্পর্কে তার আরো মতামত হলো আল্লাহ তায়ালা হলেন শ্বাশত, চিরন্তন। আল্লাহ চান মানুষও অবিনশ্বরতা পাক। তাহলে কিভাবে মানুষ মাত্র কয়েক বছর বেঁচে থেকে মারা যান? তাই মানুষের মৃত্যু হয় না, হয় শুধুমাত্র দেহান্তরের মাধ্যমে। তিনি তার দেহান্তর বা تناسخ لأرواح মতামতের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন।

এ মতের পক্ষে তিনি আরো বলেন, মানুষ জন্ম থেকেই ভাগ্যকে নিয়ে আসে। কেউ সৌভাগ্যবশত হয় দীপ্ত চেহারার অধিকারী আবার কেউবা হয় কালো বা কদাকার। কেউ হয় মেধাবী আবার কেউ হয় বোকা বা নির্বোধ। আবার মানুষকে তার সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জবাবদিহিও করতে হবে। এটা তার দায়িত্বও।

আবার তিনি নিজে নিজেকেই বলেন, আমার যেমন অনেক প্রাপ্য আছে আবার আমিও অন্যের কাছে ঋণী। তাহলে আমি বা প্রত্যেক মানুষ কিভাবে মারা যাবো? তাহলে মানুষের প্রাপ্যতা বা ঋণ শোধ কিভাবে হবে। এই যুক্তির মাধ্যমেও তিনি দেহান্তরের পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ দেহান্তর ছাড়া এ ঋণ বা প্রাপ্যতা কোনোটাই শোধ করা সম্ভব নয়।

পুণর্জন্মের পক্ষে তিনি আরেকটি মতামত ব্যক্ত করেন যেটা হলো মানুষের মাঝে ভালোবাসা বা হৃদয়ানুভূতির ব্যাপার। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাদের মাঝে এক ভালেবাসার অনুভূতি তৈরি হয়। পরবর্তীতে হয়তো সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়। তার মানে তাদের পূর্ব পরিচয় রয়েছে। তিনি পূর্ব পরিচয় বলতে প্রথম জন্মে তাদের ভালো পরিচয়ের কথা বলেছেন। আর যদি ভালো সম্পর্ক তৈরি না হয় তারমানে পূর্বজন্মে তাদের পরিচয় ছিলোনা। এর মাধ্যমে তিনি দেহান্তরের মতামতের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

৫১.হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত. পৃ- ৩৮৬-৮৭

এভাবে মিখাইল নু'আইমা তার বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। এরমাধ্যমে তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করতে চেয়েছেন। তার মতে আল্লাহ এক, তার অস্তিত্বও এক। ফ্রানসিসকো গাবরিয়ালী নু'আইমা'র দর্শন সম্পর্কে বলেন

هو أديب انسانى أكثر منه فيلوسف , وصاحب مذهب فكري معين , وكان للتيارات الجينية والمذاهب قسم وافر في نتاج نعيمة وتأثير عميق على مجري تفكيرة : المسيحية والإسلام والكفر الدينى (البوذية) الظلاقا من طاغور وغاندى [52]

"মিখাইল নু'আইমা সাহিত্যিকের তুলনায় একজন দার্শনিক হিসাবে বেশি মূল্যায়িত এবং নির্দিষ্ট একটি চিন্তাধারার প্রবর্তক। তাঁর লিখনীতে ধর্মীয় ও মাজহাবী ধারার এক বিশেষ অবদান রয়েছে। এবং তার চিন্তাধারা উপর তার একটা গভীর প্রভাবও রয়েছে। তার ধর্মীয় দিকগুলি হচ্ছে খৃষ্টবাদ, ইসলাম ও বৌদ্ধ মতবাদ যা ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত।"

নু'আইমা'র মানবীয় মূল্যবোধের ধারনা

নু'আইমা একাধারে একজন দার্শনিক, আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানী ব্যাক্তি, সমালোচক, সাহিত্যিক কবি ও বিভিন্ন বিষয়ে এক পারদর্শী লেখক ছিলেন। তাঁর মানবীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক "রোজী আরনাল্ডস্" বৈরুতস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে "নু'আইমা'র রচনায় মানবীয় মূল্যবোধ" শিরোনামে এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। যার কিছু অংশ বৈরুতস্থ النهار পত্রিকায় প্রকাশ পায়, যার মূলকথা ছিলো এইরকম যে, মূল্যবোধ মূলত তার নিকট মানবীয় বাস্তবতার এক দার্শনিক মতবাদ। তিনি নিজেকে এক বিশেষ স্তরে দেখেন। এবং সাথে সাথে বিশ্বের বিখ্যাত দার্শনিকদের সাথে তার চিন্তভাবনাকে শামিল করেন। তিনি এভাবেই নিজের চিন্তার সাথে অন্যান্য দার্শনিকের মতামতকে যুক্ত করে মতামত প্রকাশ করতেন।

---

৫২. প্রাগুক্ত. পৃ- ৩৮৬-৮৭

আরনাল্ডস্ নু'আইমা'র বিভিন্ন চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করে এ মত দেন যে, নু'আইমা'র চিন্তাধারার দুটি মূল্যবান দিক হলো ঈমান ও ভালোবাসা। ঈমান বা বিশ্বাসের প্রকাশ হবে আকীদা ও প্রথার সমন্বয়ে। বিশ্বাস হলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস। আল্লাহ সর্বত্র, সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান এই বিশ্বাস করা। এর মাধ্যমেই তৈরি হবে মানবীয় মূল্যবোধ। মানবীয় মূল্যবোধ থেকে তৈরি হবে ভালোবাসা। আর ভালোবাসা দিয়ে ঈমান হবে পরিপূর্ণ। মিখাইল নু'আইমা ছিলেন এমন এক মানবিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ ব্যক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, আধ্যাত্মিক লেখক হিসেবে আরবী সাহিত্যে তো বটেই প্রাচ্যে অন্যান্য সহিত্যিকদের মধ্যে মিখাইল নু'আইমা'র অবস্থান ছিলো গর্ব করার মতো। সাহিত্যে বিষয়ে নু'আইমা'র চিন্তাধারার সাথে সাথে মানবিক বিষয়েও তার চিন্তাধারা ছিলো প্রশংসার দাবিদার।

কায়রোর "আল-মাসরি" পত্রিকার সম্পাদক বলেছেন, "তিনি (নু'আইমা) আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য এক বিশাল ভাণ্ডার দিয়েছেন। বিদেশী ভাষার অনুবাদ ছাড়াই তার মৌলিক বই ছিলো পঁচিশটিরও বেশি।"[১]

এই বইগুলোর আকার ও বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। যা সরকারি বা বেসরকারি গ্রন্থাকারগুলোতে সংরক্ষণ করা সহজ নয়। এইজন্য "দারুল ইলম লিলমাঈন" তার লেখার প্রতিটি বই এমনকি প্রতিটি কাগজের টুকরা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে। সংরক্ষণের সাথে সাথে সংস্করণের তারিখ সহ অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ক্যাটালগসহ তৈরি করে। বন্ধু ও পাঠকমহলে মিখাইল নু'আইমা'র লেখা ছিলো প্রশংসিত।[২]

আরবী কবিতার আধুনিক ধারা নির্মানের ক্ষেত্রে মাহজার কবিদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই একদল লোক উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় হিজরত করে। এদের মধ্যে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান উল্লেখযোগ্য তিনি আরবী ভাষায় নতুনত্ব সৃষ্টি এবং নির্ভেজাল কবিতা রচনায় প্রয়াসী ছিলেন।

১.মুহাম্মদ নুর -অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ . ৫৬

২. মিখাইল নু'আইমা,*কালিমাতুন নাশের লিলমাজমুআতিল কালিমাহ*, (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিলমাঈন. ১৯৮৭) পৃ. ৫-৬

নু'আইমা'র লেখার বৈশিষ্ট্য

নু'আইমা'র লেখার বৈশিষ্ট ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্ত প্রকৃতির শব্দ দিয়ে লেখা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার রচিত সাহিত্য পাঠকরা সানন্দে গ্রহণ করতেন তার সাহিত্যের ভাষার মাধুর্যতা, জ্ঞানের পান্ডিত্য ও সৌন্দর্যের জন্য। ভাষার জাদুকরী আকর্ষণে প্রতিটি শব্দ মানুষকে আকৃষ্ট করতো। তিনি তার লেখার মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রও তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। তার লেখা থাকতো বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ও তথ্য সমৃদ্ধ লেখা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে তিনি এমনভাবে লিখতেন যেন পাঠক সত্যিকার অর্থে প্রকৃতিতেই ডুবে যাচ্ছে।

প্রকৃতির মত পাঠকের মনও শান্ত হয়ে যেতো, যেনো পাঠক প্রকৃতিকে স্পর্শ করছে, গন্ধ পাচ্ছে, প্রকৃতির রঙ্গ দেখতে পাচ্ছে। লেখকের লেখার সাথে সাথে পাঠক যেন ল্যাভেন্ডার ফুলের ঘ্রান পাচ্ছে, সুখী লোকের সাথে সুখ অনুভব করছে, দুঃখীর সাথে ব্যথিত হচ্ছে এমনই ছিলো তার লেখার বৈশিষ্ট্য। তবে তার অধিকাংশ লেখা ছিলো বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত লেখা।

মিখাইল নু'আইমা'র লেখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অনেক গভীরে চিন্তাভাবনা করে লিখতেন। মহাবিশ্ব, পৃথিবী, প্রকৃতি, মানবজীবন এর মধ্যে থাকা সমস্ত কিছুর একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। তার লেখার গভীরতার ডুব দিয়ে হয়তো এর অর্থ খুঁজে বের করা পাঠকের জন্য কঠিন হতো, কিন্তু যাই হোক এতে আত্মার জন্য ছিলো আনন্দের, মনের জন্য একটি প্রশান্তি, কল্পনার একটি মডেল। যা আবার কখনো কখনো থাকতো যুক্তি দিয়ে আবদ্ধ।[৩]

মোটকথা নু'আইমা'র সাহিত্য ছিলো অনেক সমৃদ্ধ এক সাহিত্য। যেখানে ভাষার মাধুর্যতা ও সৌন্দর্যের সাথে সাথে পাঠকের শেখার জন্য আছে অনেক তথ্য। অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান। একজন প্রকৃত পাঠক সাহিত্য পাঠে আনন্দ লাভের প্রায় সব উপকরণই নু'আইমা'র লেখায় ছিল সমালোচনা, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সামাজিক ও মননশীল প্রবন্ধে মিখাইল নু'আইমা'র ছিলো সফল পদচারণা। আমি আমার এ গবেষনায় সংক্ষিপ্ত আকারে আরবী সাহিত্যে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

---

৩. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরবী আল আদব আল হাদীস* , পৃ. ৩৮৮-৮৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাব্যে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

কবিতা বা কাব্যিক বিষয় হলো অধিকাংশ কবির জন্য সহজাত প্রবৃত্তি। ঠিক তেমনিভাবে মিখাইল নু'আইমা'রও কবিতা রচনা সহজাত প্রবৃত্তি হলেও তার কাব্যিক প্রতিভা ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী। তার কবিতা ছিলো দুই ধরনের; পুরনো ও নতুন ধারার কবিতা। তিনি পুরনো ধারার কবিতাশৈলী, অর্থের গুনাগুন, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে নতুন ধারার ছন্দবিহীন আধুনিক কবিতা রচনা করেন।

নু'আইমা'র কবিতায় তার পারিপার্শ্বিকতার অনেক বিষয় ফুটে উঠেছে। তিনি যে রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন তার প্রভাব তার কবিতায় ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় কারণে তাকে দেশও ছাড়তে হয়েছিলো। সাথে সাথে তার জীবনে দরিদ্রতার প্রভাবও দেখা যায় তার কবিতায় । যার কারণে তার নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি তার কবিতায় ফুটে ওঠে। যা ছিলো বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি।

همس الجفون (Eyelid whirpesings)

১৯১৭ সালে নু'আইমা النهر المتجد (The Frozen river), اخي(My brother), من انت يا نفسي(who are you myself ?) এই তিনটি কবিতা রচনা করেন। এমন আরো চৌদ্দটি কবিতা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৯১৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। যার সবগুলোই همس الجفون এ প্রকাশ করেন।[৩] এই বইটি আধুনিক কবিতার বিকাশের জন্য মাইলফলক স্বরূপ বিবেচনা করা হয়।[৪]

তিনি এ বইতে কবিতার আধুনিক ধারা বর্ণনা করেন যা পুরনো কবিতায় ছিলো না। এই দিওয়ানে কাব্যিক ঐক্য ও প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

---

৩. ড. মানাহ খাওরি, *মিখাইল নু'আইমা আমলাক আবরুহী ওয়ালকালাম আমমাজলি* (আমেরিকান তথ্য সংস্থা ১৯৮৮) পৃ. ২৬

৪. ড. সাইয়্যেদ হামিদ আননাসাজ ওয়াআখরুন, *আল আদাব আল আরবী আল হাদীস্* (কায়রো : আমিরি প্রেস অ্যাফেয়ার্স জেনারেল অথরি ,১৯৯৪-১৯৯৫) পৃ. ১০৫-১০৬

উদাহরণস্বরূপ সাধারণভাবে প্রবাসী কবিরা তাদেরও বেশিরভাগ কবিতায় কবিতার কাব্যিক গঠন নিয়ে বা ছন্দমিল নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু নু'আইমা এমন একজন ব্যাক্তি যিনি তার দিওয়ানে কবিতার কাব্যিক গঠন বা ছন্দ মিলকে পরিহার করে এমনভাবে কবিতাকে সাজান যেন একটি কবিতার প্রতিটি অংশ এক একটি অঙ্গ, এবং পুরো কবিতা একটি জীবন্ত দেহের মতোঁ দাড়িয়ে আছে।[৫]

এই দিওয়ানে তিনি তার জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তার জীবনের আনন্দ, বেদনাকে কবিতার রূপে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে মানবজীবনের অনেক সমস্যা ও সমাধান কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন।

মিখাইল নু'আইমা রচিত اغمض جفونك (তোমার চোখের পাতা বন্ধ কর) কবিতায় তার বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা পরিস্ফুটিত হয়। এটি همس الجفون (চোখের পাতায় ক্ষীণ আওয়াজ) এর একটি কবিতা।[৬]

إذا سماوك يوما * تحجبت بالغيوم

اعمض جفونك * خلف الغيوم جفون

والرض حولك اما* تحت الثلوج مروج

وإن بليت بداء * وقيل داء عياء

اغمض جفونك تبصر * في الداء كل الدواء

وعندما الموت يدنو* واللحد يفغر فاه

اغمض جفونك تبصر* في اللحد مهد الحياه

---

৫. ড. মানাহ খাউরি, মিখাইল নু'আইমা আমলাক আবরুহী ওয়ালকালাম আমমাজলি, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬

৬.মুহাম্মদ নুর -অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ . ৬১

যদি তোমার আকাশ একদিন * মেঘ দ্বারা আবৃত থাকে

তোমার চোখের পাতা বন্ধ করে দেখ * যে চোখের পাতা মেঘের আড়ালে

তোমার চারপাশে যে পৃথিবী আছে * আছে বরফের নীচে তৃণভূমি

আর যদি তুমি কোনো রোগে আক্রান্ত হও * আর বলা হয় এ অসুস্থতা ক্লান্তির

তোমার চোখের পাতা বন্ধ করে দেখ * সকল রোগের ঔষুধ রয়েছে

যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে * কবর তার মুখ (দ্বার) খুলবে

তখন তোমার চোখের পাতা বন্ধ করে দেখ * কবর আসলে জীবনেরই দোলনা।

এই কবিতার মাধ্যমে নু'আইমা দর্শকের চোখের মাধ্যমে কল্পনায় মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। النهر المتجد (দ্য ফ্রোজেন রিভার) কবিতাটি নু'আইমা রাশিয়ায় পোলটাভাতে ছাত্র থাকা অবস্থায় রচনা করেন । যেটিতে তার সেসময়ের উদ্বেগ, শূন্যতা ফুটে ওঠে। মানুষের ভাগ্য ভিন্ন রকমের হয়, আবার তার গতিপথও হয় ভিন্ন। এই ভাগ্যের শিকল দ্বারাই মানুষের ভাগ্যের চাকা বাঁধা থাকে। যাকে মানুষ অস্বীকার করতে পারেনা মিখাইল নু'আইমা তার النهر المتجد কবিতায় বলেন।[৭]

يا نهر ذا قلبي , أراه كما مكبلا
والفرق انك سوف تنشط من عقالك , وهو ....لا

“হে নদী, আমার হৃদয় দিয়ে তোমাকে দেখছি, যেমন তোমাকে আমি শেকলে বাঁধা দেখি, শুধু পার্থক্য হলো সেই (শেকলে বাঁধা) মনকে উজ্জীবিত করতে হবে, এটা (হয়তো) সম্ভব.... (হয়তো) না।”

---

[৭] মিখাইল নু'আইমা,*আননাহরুল মুতাজাম্মিদ ,হাফস আল জুফুন*, (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭) পৃ. ১৪

মিখাইল নু'আইমা'র আরেকটি বিস্ময়কর রচনা হলো– "দ্য ওয়াইন লিভস" (اوراق الخمر)। এই কবিতায় প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো নু'আইমা'র কবিতার স্বরের বিশুদ্ধতা, ভাষার কোমলতা ও শিল্পকর্মের স্বচ্ছতা বিদ্যামান। তিনি اوراق الخريف কবিতার একটির অংশে লিখেছেন। [৮]

تناثري تناثري

يا بهجة النظر

يا مرقص الشمس ويا

اجوحة القمر

يا أرغن الليل ويا

قيثارة السحر

يا رمز فكر حائر

ورسم روح ثائر

يا ذكر مجد غابر

قد عافك الشجر

আমার বিক্ষিপ্ততা, আমার বিক্ষপ্ততা

আমার দেখার আনন্দ

হে সূর্যের নৃত্য,

হে চাঁদের ক্ষয়

হে রাতের প্রতারণা

হে জাদুর বীণা

৮.মিখাইল নু'আইমা, "আওরাকা আল খারিফ", হাফস আল জুফুন (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭) পৃ. ৪৩

হে অতীতের স্মরনীয় গৌরব

এই গাছগুলোই দিয়েছে তোমায় নিরাময়।

এই কবিতায় তিনি প্রকৃতির নিয়মের মধ্য দিয়ে মানুষের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার নীতি ও শেষ হয়ে যাওয়ার ধারা বর্ণনা করেছেন।

কবিতায় সমালোচনা : (من انت يا نفسي)

পূর্বের কবির কবিতার মধ্যে ছিলো শৈল্পিক ঐক্য, ছন্দের মিল, প্রতিটি লাইনের বা স্তবকের সাথে পূর্বের স্তবকের বা লাইনের মিল, কিন্তু নু'আইমা তা পরিহার করে আধুনিক কবিতা রচনা করেন। তিনি ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন ধারায় কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি শুধু প্রেম, ভালোবাসা, যুদ্ধ, বিগ্রহ শুধু এসব বিষয়েই কবিতা রচনা না করে সাথে সাথে প্রকৃতির মাধ্যমে তার ভিন্ন চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন কিছুর সাথে তুলনা করে জীবন ও বাস্তবতার আসল চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি কবিতায় নতুন বিষয় নিয়ে আসেন।

নু'আইমা তার "মিন আনতা ইয়া নাফসি" কবিতায় "তুমি কে, আমার আত্মা"? এই প্রশ্নের মাধ্যমে জীবনের অনেক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। এবং সবশেষে এই উপসংহারে আসেন যে, আত্মা এক এবং ঈশ্বরও এক। এবং সাথে সাথে এটাও বলেন যে, আত্মা আসলে ঈশ্বরেরই অংশ ও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।[৯]

উদাহরণ স্বরূপ তিনি তার "মিন আনতা ইয়া নাফসি" এই কবিতায় বাতাস, ঢেউ, হাওয়া, সমুদ্র, সমুদ্রের গর্জন, সূর্যের প্রখরতা, বজ্রপাত, ভোর, রাত ইত্যাদি প্রকৃতির বিষয়গুলো বর্ণনা করেন। আর এটি তিনি পেয়েছিলেন পশ্চিমা কবিতা থেকে। কারন পশ্চিমা কবিতাতে প্রকৃতির প্রভাব ছিলো অনেক। তিনি এই কবিতায় বলেছেন।[১০]

---

[৯] মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন* (বৈরুত:দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭) পৃ. ৪৩৭

[১০] মিখাইল নু'আইমা, *"মিন আনতা ইয়া নাফসি" হামস আল জুফুন* (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭) পৃ. ১৫-১৯

إن رأيت البحر يطغي - الموج فيه ويثور

او سمعت البحر يبكي - عند اقدام الصخور

ترقبي الموج إلي أن- يحبس الموج هديرة

وتناجي البحر حتي- يسمع البحر زفيره

راجعا منك إليه- هل من الامواج جئت؟

إن سمعت الرعد يدوي - بين طيات الغمام

أو رأيت البرق يفري – سيفه جيش الظلام

ترصدي البرق إلي أن- تخطفي منه لظاه

ويكف الرعد لكن – فاركا فيك صداه

هل من البرق انفصلت- أم مع الرعد انحدرت؟

إن رأيت الفجر يمشي- خلسة بين النجوم

ويوشي جبة اليل المولي بالرسوم

يسمع الفجر ابتهلا – صاعدا منك اليه

وتخري كنبي –هبط الوحي عليه

بخشوع جاثية –هل من الفجر انبثقت؟

إن رأيت الشمس في- حضن المياه الزاخره

ترمق الأرض وما فيها –بعين ساحره

تهتج الشمس وقلبي –يشتهي لو تهجعين

وتنام اللأرض لكن – انت يقظي ترقبين

مضجع الشمس البعيد –هل من الشمس هبطت؟

إن سمعت البلبل الصداح بين الياسمين

يسكب الألحان نارا- في قلوب العاشقين

تلتظي حزنا وشوقا- والهوي عنك بعيد

فاخبريني هل غنا البلبل في الليل يعيد

ذكر ماضيك إليك- هل من الألحان أنت؟

إيه نفسي ، أنت لحن – في قد رن صداه

وقعتك يد فنات- خفي لا أراه

أنت ريح؟ ونسيم- أنت موج ؟ أنت بحر

أنت برق ؟ أنت رعد – أنت ليل ؟ أنت فجر

أنت فيض – من إله

যদি তুমি দেখতে পাও যে সমুদ্র তার ঢেউগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে

অথবা তুমি শুনতে পাও যে, সমুদ্র কাঁদছে, পাথরের পদদেশ ঘেষে

(সমুদ্রের) তরঙ্গের দিকে তাকাও যতক্ষণ না ঢেউ তার গর্জন

এবং সমুদ্রকে ডাকে যতক্ষণ না সমুদ্র তার দীর্ঘশ্বাস শুনে

তোমার কাছ থেকে তার কাছে ফিরে, তুমি কি ঢেউ থেকে এসেছ?

তুমি যদি মেঘের ভাঁজের মধ্যে বজ্রধ্বনি শুনতে পাও,

অথবা বিদ্যুতকে পালিয়ে যেতে দেখ– তার তলোয়ার অন্ধকারের বাহিনীকে

যতক্ষণ না বজ্রপাতকে অনুসরণ করে তুমি ক্ষণিকের জন্য তাকে (আলোকে) নাও

তখন বজ্রপাত থেমে যায়, কিন্তু তোমার মধ্যে তার প্রতিধ্বনি রেখে যায়

সেই প্রতিধ্বনি কি বজ্রপাত থেকে আলাদা এসেছে, নাকি বজ্রের সাথেই এসেছে?

তুমি যদি ভোরে হাটতে যাও দেখতে পাবে তারকারাজির মধ্যে চুপিসারে

রাতের পোষাক পরিহিত, যাতে রয়েছে প্রভুর স্মরণ

প্রভাত একটি মন্ত্র শুনতে পায় যা তোমার কাছ থেকে এসেছে

এবং নবী হওয়ার জন্য তার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল

শ্রদ্ধায় নতজানু হয়ে সেটা কি প্রভাত থেকে আর্বিভূত হয়েছিল

যদি আমি সূর্যকে দেখি সেখানে আছে প্রচুর জলের অবস্থান

যা মনোমুগ্ধকর চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে

সূর্য ঘুমায় এবং আমার হৃদয়ের ইচ্ছা যদি তুমিও ঘুমাও

আর পৃথিবীও ঘুমায় কিন্তু তুমি জেগে আছ

সূর্য থেকে বিছানা অনেক দূরে, তবে কি সূর্য দূরে সরে গেছে?

তুমি যদি জুঁইফুলের মধ্যে বুলবুলির গান শুনতে পাও

গানের সুরগুলো প্রেমিকদের হৃদয়ে আগুন ঢেলে দেয়

তোমার বিষাদময় ও আকাঙ্খা ভরা হৃদয়ে, মায়া ভালোবাসা তোমার থেকে অনেক দূরে

আমাকে বল বুলবুলি আসলে রাতে কি গাইছিলো

সেই সুর কি তোমার অতীতকে মনে করিয়ে দেয়?

হে আমার প্রাণ, তুমি এক সুর তার মধ্যে তার প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে

এক শিল্পের হাতের ছোঁয়ায় আমি লুকিয়ে আছি

তুমি কি বাতাস? অথবা স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বাতাস? তুমি কি বয়ে চলা সমুদ্র?

তুমি কি উজ্জ্বল আলো? অথবা বজ্রধ্বনি? বা রাত অথবা ভোর?

তুমি ভোরের উজ্জ্বল ধারা একজন কবির দেবতা ।

এই কবিতায় কবি কবিতার শিরোনামে নিজেকে প্রশ্ন করেন কে তুমি? তিনি এটি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে নিজেই বিভ্রান্ত হন। কারণ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পান। তিনি সমুদ্রের ঢেউকে দেখেন পাথরের পাদদেশে কাঁদতে আবার কিছুক্ষণ পর সেই ঢেউতরঙ্গ থেমে যায়। আবার দেখেন আকাশে মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের উজ্জ্বল আলো, ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মায়া, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, বুলবুলির সুমিষ্ট গান যা তার পুরনো দিনের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। কবি প্রকৃতির এই বিভিন্ন উপাদানে মুগ্ধ। এবং সাথে সাথে এটাও মনে করেন একজন দক্ষ শিল্পীর হাতের ছোঁয়ার এই প্রকৃতি হয়ে ওঠে আরো শিল্পময়। সবশেষে কবি মনে করেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এগুলো সব আল্লাহর দেয়া দান ও প্রাচুর্যে ভরা পৃথিবীর রূপ।

এ কবিতায় তিনি পূর্ববর্তী কবিতার রীতির সাথে আধুনিক কবিতার সমন্বয় করেছেন। মানবজীবনের অনুভূতি তিনি প্রকৃতির অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি এই কবিতায় তার অনুভূতিগুলো মানুষের মতো যেমন- সমুদ্রের পায়ের কাছে কাঁদে শিলা, ভোর নক্ষত্রের মধ্যে চুপিচুপি হেঁটে যায়, সূর্য টলমলে জলকে ছুঁয়ে যায় এবং মন্ত্রমুগ্ধ চোখে পৃথিবীর দিকে তাকানো ইত্যাদি অনুভূতিগুলো তিনি প্রকৃতির সাথে তুলনা করেছেন।

এই কবিতার সবই একই ছন্দের। কিন্তু কবিতার ছন্দ ও রূপকে নতুনভাবে পুন:সংযোজিত করেছেন যা আধুনিক কবিতায় প্রচলিত। তিনি কোথাও কবিতার একটি শ্লোককে করেছেন প্রসারিত বা দীর্ঘায়িত। আবার অন্য শ্লোককে করেছেন সংক্ষেপিত। আরব বিশ্বে এই ধরনের কবিতার সুর ও ওজন ছিল প্রাচীন।

তিনি এই কবিতার প্রতিটি অংশে শেষের শ্লোকের সাথে পরের অংশের শুরুর শ্লোকের মিল রাখতেন। যা প্রাচীন কবিতায় পাওয়া যায় না।[১১]

আখি (اخي) কবিতার নতুনত্ব :

গল্প, নাটক, কবিতায় সাহিত্যের সব শাখায় নু'আইমা'র ছিলো সফল পদচারনা। তার অন্যান্য কবিতার মধে "আখি" (اخي) কবিতাটি অন্যতম। এই কবিতায় নু'আইমা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লেবাননের দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সময়ে যখন তিনি ফ্রান্সে আমেরিকান সেনাবাহিনীতে সৈনিক ছিলেন। সেসময়ের মর্মান্তিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতায় পুত্রের মৃত্যু, একে অপরকে সমাহিত করা, যুদ্ধের বিপর্যয়, ভাগ্যের পরিহাস ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরেছেন ।

নু'আইমা'র সমগ্র শিল্পকর্মে রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাপ। তার কবিতা অন্তমিলে প্রাচীনরীতি বর্জিত এবং জটিলও দুর্বোধ্য শব্দ থেকে মুক্ত। তার লেখা "আখি" (আমার ভাই) কবিতাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কবি আত্মমগ্ন, বিদ্রোহী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাই অন্যায় ও অবিচারের বিরূদ্ধে বলেন,[১২]

أخي من نحن ؟ لا وطن ولا أهل زلا جار

إذا نمنا ، إذا قمنا ، ردانا الخزى والعار

لقد خمت بنا الدنيا ، كما خمت بموتانا

فمات الرفش واتبعنى لنحفر خنذقا آخر

نوارى فيه أحيانا ....

---

১১. S. MORE MODERN ARABIC POETRY 1888-1970 (LIEDEN: E.J.BRIL 1976) P.94

১২.মিখাইল নু'আইমা ,*"আখি" হামস আল জুফুন* (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭) পৃ. ১৪

*আমার ভাই আমরা কারা? দেশ নেই, নেই পরিবার প্রতিবেশী।

* যখনই ঘুমাই, কিংবা জেগে উঠি দেখি সর্বাংগ জুড়ে লজ্জার পোশাক।

* আমাদের মৃতদেহের গলিত রক্ত-পুজ এ পৃথিবী নষ্ট আজ।

* এসো নতুন কোদাল হাতে নতুন কবর খুড়তে এসো আমার সাথে।

* সে কবরে লুকাবে একে একে জীবন্ত আত্মা আমাদের ।[১৩]

মিখাইল নু'আইমা "দ্যা ফ্রোজেন রিভার" (النهر المتجد) রচনার পর "আখি" (اخي)কবিতাটি রচনা করেন। তিনি কবিতাটি এমনভাবে রচনা করেছিলেন যেন এর শব্দগুলো আদেশ বা নির্দেশসূচক।একটি শব্দের প্রভাব আরেকটি শব্দের মধ্যে বিদ্যমান। এই কবিতাটি তিনি নাসীব আরীদাহ্‌র অনুরোধে প্রকাশিত হবার পূর্বে ব্রুকলিনে একটি সভায় পেশ করেন। এবং সেখান থেকে এই কবিতার জন্য অনেক প্রশংসিত হন।[১৪]

এই কবিতায় প্রথম স্তবকের সাথে দ্বিতীয় স্তবক সম্পর্কিত। এরপর তৃতীয় স্তবক আবার নতুন ভাবে আলোচনা করা হয়। কখনও বলা হয় "আমাদের মৃত অবস্থা", আবার এর মধ্যে অনেকবার "আমি" টোনটি ব্যবহার করা হয় কবিতার ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। কিন্তু প্রতিটি স্তবকের শেষে একটি আশা নিয়ে শেষ করা হয়েছে। এই কবিতার ভাষার অলঙ্করণ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, যার মাধ্যমে কবির দেশের তৎকালীন দুর্দশা, দূর্ভিক্ষের অবস্থা চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। সমকালীন দেশের চিত্র শব্দের মাধুর্য দ্বারা এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানুষের দেখে বা শুনে মুগ্ধ হবার জন্য নয়। বরং তা যেন মানুষে হৃদয় বা আত্মাকে আলোড়িত করে। মিখাইল নু'আইমা এক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। "আল ফুনুন" পত্রিকায় এ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আরব বিশ্বে এ কবিতা আলোড়ন ফেলে।[১৫]

---

১৩. নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। পৃ .২৮১

১৪. মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

১৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৩

তার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য :

তার রচিত “হামস আল জুফুন” কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, নু'আইমা'র কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিলো স্বরের বিশুদ্ধতা, ভাষার নমনীয়তা, শব্দের উপস্থাপনার স্বচ্ছতা, শব্দকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করার এক অন্য ধরণের ক্ষমতা ও কবিতাকে মানুষের হৃদয়গ্রাহী করার আন্তরিকতা, তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও খুব সৎ ও মানবদরদী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যিক জীবনেও তিনি সমাজ ও মানবতার সমস্যাগুলো খুব সাধারণ ভাবে পাঠকের সমানে তুলে ধরেছেন।

তিনি কবিতার ছন্দ ও স্তবকে ভিন্ন ধারা ব্যবহার করে মানবজীবনের দুঃখ, ভালোবাসা সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কবিতার ব্যাপারে মিখাইল নু'আইমা'র দৃষ্টিভঙ্গি

মিখাইল নু'আইমা জন্মসূত্রে লেবাননী। কিন্তু তার দীর্ঘ জীবন কেটেছে আমেরিকা ও রাশিয়ায়। তিনি পড়াশোনা করেছেন আমেরিকা ও রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুতরাং তার মন ও মগজে পাশ্চাত্যোর যে হাওয়া লেগেছিল তার যথার্থ পরিস্ফুটন ঘটেছে তার কবিতায়। তার কবিতা শাওকী ও হাফিজের কবিতার স্টাইল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার কবিতা আল-আক্কাদের কবিতার সাথে সাদৃশ্য রাখে। কবিতা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগী হলো:[১৬]

১. কবি তার যুগের জন্য সীমাবদ্ধ নয় নিছক জাতির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশই তার একমাত্র কাম্য নয়।

২. কবিতায় সুরের প্রবাহ প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু অন্তমিলের প্রয়োজন নেই।

৩. যে কোনো ছোট একটি বিষয় অবলম্বনেও কবিতা লেখা যেতে পারে।

৪. কল্পনা ও অনুভুতির রস নিংড়ে হয় কবিতার সৃষ্টি।

---

[১৬] নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদে। পৃ .২৮১

কবিতায় নতুন ধারার ব্যবহার :

তিনি আরবী কাব্যাংঙ্গনে পুরনো রীতি বা নিয়মকে বাদ দিয়ে নতুন নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার কবিতাগুলি ছিল সহজ সরল আন্তমিলবর্জিত ও সামান্য অশৃংখলিত ছন্দ বিশিষ্ট। এছাড়াও তার কবিতায় লেবাননের লোকগীতিরও (Folk Poetry) যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১৭] তার একমাত্র দীওয়ান "(همس الجفون Eyelid whispesings)" চোখের পাতার ক্ষীণ আওয়াজ ১৯৪৫ খ্রি. লেবাননের বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই দিওয়ানের কবিতাগুলো তিনি ১৯১৭ খ্রি. থেকে ১৯৩০ খ্রি. এ সময়ের মাঝে রচনা করেন। পরবর্তীতে সবগুলোকে একত্রে همس الجفونনামে প্রকাশ করেন। তার এ কাব্য সম্পর্কে Ismat Mahdi বলেন:[১৮]

Though Few in number, these poems one important both from the point of view of Nu'aimas philosophy and the development of Mahjar poetry.

তার ابتهالات নামক কবিতায় তিনি বলেন : [১৯]

فی غنا البلبل - فی ندب الغراب
فی دبیب النمل- فی هب الریاح
فی طنین النحل - فی زعق العقاب
فی صراخ اللیل - فی همس الصباح
فی بکا الأطفال-فی ضحك الكهول
فی ابتهالات العرات الجائعین

---

[১৭] John A Hayuood Modern Arabic Literature, 1800-1970 (London 1971) P 175

[১৮] Ismat Mahdi ,Modern Arabic Literatuer 1900-1967, Hyderabad Andhra Pradesh India, 1983 p-154

[১৯] মিখাইল নু'আইমা "হামছ আল জুফুন" *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* (বৈরুত: দার আল ইলম লিল মালাঈন ১৯৮৬ খ্রি.) চতুর্থ খণ্ড. পৃ. ১৪

فى انتحاب الناى – فى دق الطبول

فى صلاة الملك والملك والعبد السجين

وإذا ما قرب الموت ووافاها الصمم

فاختمن ربى عليها ريثما تحيا الرمم -

“বুলবুল পাখির গান, কাকের কা কা ধ্বনি

পিপীলিকার মন্থর গতি, বাতাসের প্রচণ্ড গতি

মৌমাছির গুনগুন ধ্বনি, বাজপাখির কর্কশ শব্দ

রাতের আর্তনাদ, ভোরের ফিস্‌ফিস্‌ ধ্বনি

শিশুদের ক্রন্দন, বৃদ্ধদের হাসি।

উলঙ্গ ক্ষুধার্ত নারীদের বিনীত প্রার্থনা

রাশির বিলাপ ধ্বনি, তবলার শব্দ

রাজার প্রার্থনা ও বন্দী ক্রীতদাসের আহাজারী

মৃত্যু যখন তাদের নিকটবর্তী হয়, বধিরতা যখন তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলে

হে প্রভু! তখন তুমি তাদের উপর সিলমোহর অঙ্কিত কর।

যতক্ষণ না মৃত আত্মা পুনঃজাগ্রত হয়।”[২০]

---

[২০] নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। পৃ. ২৭৮

মিখাইল নু'আইমা অমিল যুক্ত ছন্দময় গদ্য কবিতা রচনা করেন। এ ধরনের কবিতায় কবি কখনো কখনো মিল ও ছন্দ রীতির অনুসরণ করলেও প্রতি ছত্রের পরিমাপ ঠিক রাখেননি। কবিতায় তিনি শব্দের নিগুঢ় রহস্য, সুর ও ঝঙ্কার বুঝে শব্দ নির্বাচন করতেন। উত্তর আমেরিকাতে অবস্থানকালে তিনি আরবী গদ্য কবিতাও চর্চা করেন।[২১]

মিখাইল নু'আইমা বলেন :[২২]

سيرى بقلب خافق
فى موكب الفضا
تعانقى! تعانقى ،
سيرى ولا تعاتبى
لاينفع العقاب
ولا تلومى الغصن
والرياح والسحاب
فهى إذا خادبتها
لا تحسن الجواب

---

[২১]. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/clearcut27/30095637

[২২]. মিখাইল নু'আইমা, *আ মাজমু'আ আল কালিমাহ*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪

স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে এগিয়ে যাও ভাগ্যের কাফেলায়

তুমি আলিঙ্গন কর ! আলিঙ্গন কর !

তুমি দেখবে এবং তিরস্কার করবে না

তিরস্কার করে কোনো লাভ হবে না

এবং (গাছের) শাখাকে দোষারোপ করবে না

দোষারোপ করবে না বাতাস ও মেঘকে

আর যদি তুমি তাদের দোষারোপ কর

তবে তুমি উত্তরের সৌন্দর্য পাবে না।

তার রচিত কবিতা أوراق الخريف (Autumn Leaves) সম্পর্কে ইসমাত মাহদী বলেন,[২৩]

Autamn leaves (Auraq al-Kharif), Symbolise The diffenent Stages of man’s Life up to the hour of his death. As there is no escape from death Nu’aima suggests that man should aceept it happily for he is passing from one stage to another He dids the outumn Leaves to retunn to the Earth’s fold.

মিখাইল নু‘আইমা ভালবাসা ঘৃণা ভালো মন্দ, সমুদ্র প্রকৃতি নিয়েও কবিতা রচনা করেন। أنشودةনামক কবিতায় ভালোবাসা, ঘৃণা ও ভালো মন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,[২৪]

قدمت حبى لمبغضيا * لقاء ما قد جنوا عليا
فكنا حظى من مبغضيّا * أن عاد حبى بغضا اليّا

---

[২৩] Ismat Mahdi ,Modern Arabic literaatur, p. 158. নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৮

[২৪] মীখাইল নু‘আইমা “হামস আল জুফুন” *আল-মাজমু‘আ আল কালিমাহ* , পৃ ৬০. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হাদ্দারাহ দারাসাত ফি আল শির আল-আরবী আল হাদীস (বৈরুতঃ দার আল-উলুম আল আরাবিয়্যাহ ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ৩২

যারা আমাকে ঘৃণা করে আমি তাদের কাছে আমার ভালোবাসা নিবেদন করছি,

আমার বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণার পুরস্কার হিসাবে।

যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের কাছ থেকে আমার প্রতিদান এই যে

আমার ভালোবাসা আমার কাছে ঘৃণা হিসাবে ফিরে এসেছে।

আধ্যাত্মিক, রোমান্টিক ও ভালোবাসা নিয়ে মিখাইল নু'আইমা'র কবিতা রচনা

মিখাইল নু'আইমা আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত একজন লেখক ও কবি। তিনি তার শিক্ষা ও অন্যান্য কারণে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক কবিতা রচনা করেন। পুনর্জন্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি আধুনিক বিষয়েও কবিতা রচনা করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক ও আধুনিক বিষয়ের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করেন। তিনি তার কবিতায় একইসাথে আধ্যাত্মিক ও রোমান্টিক চিন্তা প্রকাশ করেছেন।

নু'আইমা'র রচিত কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তিনি প্রথমে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক কবিতা রচনা করেন। এরপরই তিনি আধ্যাত্মিক ও ভালোবাসার ব্যাপারে কিছু রূপক অর্থ ব্যবহার করে কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তার কবিতায় একইসাথে আধ্যাত্মিক ও রোমান্টিক বিষয়ে সাংঘর্ষিক এমন কোনো বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়না। তিনি কবিতার মাধ্যমে মানবজাতির হৃদয়ের আবেগকে প্রয়োজনীয় বলে উপস্থাপন করেছেন। তার কবিতায় থিওসফিক্যাল চিন্তাধারার প্রভাব ও প্রেমের জটিল প্রতিকৃতির প্রভাব উভয়ই বিদ্যমান।[২৫]

মিখাইল নু'আইমা জীবন মৃত্যু, ভালো-মন্দ, ভালোবাসা ও ঘৃণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সালমা খাদরা জায়্যুসী বলেন,[২৬]

"His poetry with its message of altruistic love: its dualistic attitudes towards life and death, and towards good and evil, love and hate is a further confinmation of both Sufi and christion literany trditions.

25.https//www.resewrehgete.net/publication/33992917-Theosophy-romanticism-and-love-in the poetry of Mikhail Nuaimy.

But despite its many achievements, Nu’aima’s Poetry was also an example of dilution and verbosity as was Gibran’s poetic prose style. Arabic poetry would struggle for a long time to rid itself of the effects of a diluted style, gently confirmed by writers of the North Mahjar.

---

26. Salma Khadra Jayyusi, Trends and movements in Modern arabic poetry,P.121 . উদ্ধৃতঃ নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ , প্রাগুক্ত পৃ. ২৮০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

আধুনিক আরবী সাহিত্যে সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমা'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। পন্ডিতেরা এব্যাপারে একমত যে, নু'আইমা আরব লেখক সংঘের একজন অবিসংবাদিত সমালোচক এবং পুরনো রীতি অনুকরণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিদ্রোহী প্রবাসী লেখক। সাহিত্যকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সমালোচনা সাহিত্যকে তিনি স্বকীয়স্বত্তায় পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন। সমালোচনার মাধ্যমে কীভাবে সাহিত্যকে আরো সুন্দর ও গ্রহনযোগ্য করা যায় তার জন্য নু'আইমা'র অবদান আরবী সাহিত্যে অসামান্য।

গিরবাল (الغربال)

গিরবাল (الغربال) বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এই বইটি শিল্প, সাহিত্য সমালোচনা ও আধুনিক সাহিত্যের নবজাগরণের পথ প্রশস্ত করেছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটি নতুন প্রজন্মের সাহিত্য রুচি গঠনেও প্রশংসনীয় প্রভাব ফেলেছিলো। এই বইটি সমালোচনামূলক সাহিত্য গবেষনার একটি সংগ্রহ যা লেখক পূর্বে প্রবাসী লেখকদের বিভিন্ন পত্রিকায় ও সাময়িকীতে প্রকাশ করেছিলেন।

এই বইটি দুটি অংশ প্রথমটিতে রয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন মূল্যায়ন। সাহিত্যকে আধুনিকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও সংজ্ঞা বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অংশটিতে বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনা রয়েছে।[২৫]

"আল গিরবাল" বইটিতে অনেক মূল্যবান তথ্য, সমালোচনার সততা, সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা, কার্যকরী পদ্ধতিতে সাহিত্যের সমালোচনা করা হয়েছে। মিখাইল নু'আইমা রচিত "গিরবাল" (الغربال) গ্রন্থে তার সমালোচনা বিষয়ে নানা বিষয়ের বিকাশ ঘটে। তার এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ বলেন,

---

[২৫] ড.মানাহ আল খাওরি, *মিখাইল নু'আইমা আমলাকুর রুহী ওয়াল কালাম*, ইস্যু ২১২। পৃ. ২৬

وأكاد أقول إنه لولم يكتب قلم النعيمى هذه الاراء التى تتمثل للقارئ فى هذه الصفحات لوجب أن أكتبها أنا . فأما وقد كتبها وحمل عبئها فقد وجب على الأقل أن أكتب مقدمتها......[26]

"মিখাইল নু'আইমা'র কলম যদি পাঠকদের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সমালোচনার এ মতামত গুলো না লিখতো তাহলে অবশ্যই আমার উপর তা লিখা বাধ্যতামূলক ছিল। মিখাইল নু'আইমা এ গ্রন্থটি লিখে আমার সামনে উপস্থাপন করলে এর ভূমিকা লেখা আমার দায়িত্ব হয়ে পরে।"

ফি আল গিরবাল আল জাদীদ (في الغربال الجديد)

"ফি আল গিরবাল আল জাদীদ" বইটিতে মিখাইল নু'আইমা বিশ্বের মহান লেখকদের সমালোচনা ও তাদের সমালোচনামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবদ্ধ সংগ্রহ করে উল্লেখ করেছেন এদের মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার মহান লেখক টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইলিয়াস আবু শাবকা, খলিল মুতরান, পুশকিন, মুস্তফা ফারুক ও অন্যান্য বিখ্যাত লেখকগণ।[২৭]

আল মারাহিল : (المراحل)

"আল মারাহিল" বইটি মিখাইল নু'আইমা'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধের একটি সংকলন। এটি ১৯৩২ সালে লেবাননে ফিরে আসার পর প্রকাশিত হয়েছিলো, প্রবাসী লেখক হিসেবে লেবাননে ফিরে আসার পর এটি ছিলো তার প্রথম প্রকাশিত বই।[২৮]

---

২৬. মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল ভূমিকা (আব্বাস মাহমুদ আর আক্কাদ), *আল মাজহমু'আ আল কালিমাহ*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

২৭. মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল আল জাদীদ*, আল মাজমুআ আল কালিমাহ, প্রাগুক্ত, ভলিউম-৭, পৃ. ২০৩-৩৬৯

২৮. মিখাইল নু'আইমা, আল মারাহিল, *আল মজেমুআ আল কালিমাহ*, প্রাগুক্ত, ভলিউম-৫, পৃ. ১০৩-১০৭

নু'আইমা'র সমালোচনার তত্ত্ব :

আরবি কবিতার আধুনিকায়নে ও বিস্তৃতিতে নু'আইমা'র অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তার বিরল প্রতিভার মাধ্যমে সমালোচনা সাহিত্যকে পূর্ণতা দান করেন। আরব, রাশিয়ান, আরব সভ্যতার ঐতিহ্য ও নিজের ব্যাপক সাহিত্য ভান্ডারের মাধ্যমে এ সাহিত্যকে তিনি করেছেন সমৃদ্ধ।

নু'আইমা'র সমালোচনা ছিলো প্রাচীন সমালোচকদের ভাষাতাত্ত্বিক ও অলঙ্কারপূর্ণ সমালোচনার মান থেকে ভিন্ন। তিনি ইংরেজী লেখক ম্যাথিউ আর্নল্ড দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার মতে একজন সমালোচক সাহিত্যকর্মের সমালোচনা, বিচক্ষণতা ও গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে মূলত তার নিজের বিচক্ষণতাকেই প্রকাশ করেন।

তার সমালোচনার মূলতত্ত্ব হলো জীবন ও সাহিত্য। আসলে জীবন সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্যিকারের সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো বাস্তবতা, আবেগ, রহস্য ও কল্পনার আলোকে মানুষের জীবনকে ফুটিয়ে তোলা। তার দৃষ্টিতে সৃজনশীলতা হলো সৎ ও সুন্দর অভিব্যক্তির প্রকাশ। সাহিত্যকে সমালোচনার মাধ্যমে কখনো কোথাও কোনো শব্দকে বাদ দিয়ে সঠিক শব্দের ব্যবহার করতে হয়। আবার কোনো শব্দকে কখনো কখনো বাদ দিয়ে দিতে হয়।

নু'আইমা কবিতার বিষয় শুধুমাত্র প্রশংসা, গর্ব, বিলাপ ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। জিবরান খলিলের মতো তিনিও শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ে কবিতা রচনায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এগুলো মূলত আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধির পথে বাঁধা ছিলো। আরবী সাহিত্য স্থবিরতার কারণ ছিলো নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা। এ নিয়ে বলেছেন, কবিতা ও সঙ্গীত যদি একই হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রকৃত ছন্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে অন্যান্য শিল্পের মতো কবিতা ও সঙ্গীতের সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য, ভারসাম্য ও সংগতি থাকতে হবে।[২৯] কবিতা রচনায় তিনি ছন্দমিলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি ছন্দবিহীন নতুন শৈলী ব্যবহারের পক্ষে বলেছেন। যা তিনি "সরল কবিতা" নামে অভিহিত করেছেন। জিবরান, আর-রিহানী ও আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানও এর পক্ষে ছিলেন।

---

২৯. মুহাম্মদ নুরু অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ . ৭৪

নু'আইমা সমালোচনার ক্ষেত্রে যে নতুন বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেগুলোই নু'আইমাকে সমসাময়িক আরব কবিদের থেকে আলাদা করেছে। যার উজ্জ্বল প্রমাণ হলো "আল গিরবাল"। যা ছিলো তার নতুন ধারায় ছন্দবিহীন কবিতায় মডেল। এটি ছিলো একটি প্রধান কাজ। যা জিবরান তাদের গ্রুপে সম্পন্ন করতে সফল হতে পারেননি। সকল সমালোচনা সত্ত্বেও তার কবিতা সকল মানদন্ডেই প্রবাসীদের এক নতুন ধারার সাহিত্যের দিকে আহ্বান করে।[৩০]

মিখাইল নু'আইমা'র দৃষ্টিতে আরবী ভাষা :

আধুনিক আরবী সাহিত্যের পাঠকরা এটা জানেন যে, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ও "আরব লেখক সংঘের" লেখকরা লেখকদের ব্যাকরণে শিথিলতা ও সাহিত্য প্রকাশের সামান্য শিথিলতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মিখাইল নু'আইমা এটা গ্রহন করেননি। তাই নু'আইমা বলেন "আমি আল আক্কাদ ও অন্যদের কাছে স্বীকার করতে চাই, "আল রাবিতা আল কালামিয়্যা" এর লেখকদের আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও অলংকরণ পদ্ধতির শিথিলতা গ্রহণ করেছিলেন। আমি আবার বলেছি আমি অভিধানের আশ্রয় নেইনি। এর মানে এই নয় যে, আমি অভিধানের মূল্যায়ন করিনি। বরং আমি বলতে চেয়েছি অভিধান বা শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। অভিধান হলো এক আশ্চর্যজনক কোষাগার। আর এই কোষাগারটি অনেকটা পুরনো বাড়ির মতো হয়ে যায়। যার অধিবাসীরা সেই বাড়ির কিছু আসবাবপত্র পরিবর্তন করে যে নতুন আসবাবপত্র যোগ করা দরকার সেটা ভুলে যায়।

যদি আমরা বলি যে আরবি ভাষা আজকের মতোই পূর্বেও এমন নিখুঁত ছিলো, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় আমাদেরকে এই কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, এটি এমন ভাষা যা সম্মানিত বেদুঈনদের থেকে এসেছে । এবং ব্যাকরণবিদরা দুই হাজার বছর ধরে একই নিয়মে আবদ্ধ হয়ে আছেন তার স্বীকৃতি দেয়া। যেমন কোনো নবীর বাণী বা দেবতার দেয়া বাণীর মতো যেখান থেকে একটি অক্ষরও বাদ দেয়া যাবে না বা একটি অক্ষর যোগ করাও যাবে না। এ অবস্থায় আমাদের কলম

---

[৩০] ড. মানার আল খাউরি, *মিখাইল নু'আইমা আমলাকুর রুহী ওয়াল কালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

ভেঙ্গে গেলেও এ নিয়ম ছাড়া লেখার কোনো উপায় নাই। অথচ ভাষা আমাদেও, নিয়মকানুনও আমাদের হওয়া উচিত। আর ভাষাশৈলীর ব্যাপারেও আমি স্বীকার করতে চাই যে, আমার সাহিত্য জীবনের শুরুতেও আমার ভাষাশৈলী সম্পূর্ণ রূপে আরবী শৈলী ছিল না। আমার ভাষাতে কিছুটা ফ্রান্সের ও রাশিয়ান ভাষার প্রভাব ছিলো। ১৯০৬ সালে রাশিয়ান সেমিনারে ভর্তির পর থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পড়া পর্যন্ত আমার সাহিত্যে বিদেশী ভাষার প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[৩১]

---

[৩১] মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, *আল মাজমুআ আল কালেমা*, প্রাগুক্ত, ভলিউম-১ পৃ. ৪৭০-৪৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্প ও উপন্যাসে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

আরবী সাহিত্য গল্প ও উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লেখকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রয়েছেন জিবরান খলীল জিবরান, মিখাইল নু'আইমা, আর -রিহানি ও অন্যান্য প্রবাসী লেখকগণ।

মিখাইল নু'আইমা'র গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রয়েছে। আমরা তার গুরুত্বপূর্ন লেখাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

মিরদাদ (مرداد) :

সাহিত্যিক হিসেবে যে কয়েকটি বই মিখাইল নু'আইমা'র সহিত্যিক জীবনে সাড়া ফেলেছিলো তার মধ্যে "মিরদাদ" অন্যতম। বইটি ১৯৪৮ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি আরবী ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়। এই বইটি দুইটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশে তিনি ভূমিকা উল্লেখ করে গল্পের মাধ্যমে জীবনী উল্লেখ করেছেন। আরেকটি অংশে "মিরদাদ" বইটির শিক্ষা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩২ সালে লেবাননে ফিরে আসার পর তিনি যে কয়েকটি বই লিখেছিলেন "মিরদাদ" এর মধ্যে একটি অন্যতম আলোচিত বই। নু'আইমা'র অধিকাংশ রচনাতেই তার বুদ্ধিমত্তা মেধার পরিচয় প্রকাশ পায়। সকল রচনার মধ্যে "মিরদাদ" তার মেধার অনন্য স্বাক্ষর বহন করে। এই বইটির সারাংশে তিনি মানুষ তার নিজের সম্পর্কে যে ধারনা পোষণ করে তার বর্নণা করেন । এই মহাবিশ্বে একজন মানুষ সর্বপ্রথম যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করে সেটা হলো সে নিজেই। সে তার নিজের আবেগ, সুখ, হাসি, কান্না, জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে। এভাবে মানুষ নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে বাস্তবতা ও সচেতনতা লাভ করে। এভাবে সে তার সাথে সম্পর্কিত সবকিছু দেখতে দেখতে সে নিজেকে ভালোবাসে, নিজেকে চিনতে শেখে। পরবর্তীতে একজন মানুষের নিজের মধ্যে তার স্রষ্টাকে খুঁজে পায়। সবকিছুতে সে সৃষ্টিকর্তার কাজ দেখতে পায়। এভাবে প্রকৃত মানুষ তার অস্তিত্বে দুটি মেরু দেখতে পায়। ছোট মেরুতে সে স্বয়ং নিজেকে দেখে আর সর্বোচ্চ মেরুতে সে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করে। পৃথিবী ও

আকাশের মধ্যে সে তার জীবনে সৃষ্টিকর্তার অজস্র নেয়ামত দেখতে পায়। পার্থিব এ জীবন কারাগার থেকে মুক্তি মিলে সংগ্রামের মাধ্যমে এবং চিরন্তন অস্তিত্বে ফিরে আসে।[৩২]

এই বইটিতে মূলত নু'আইমা মহাবিশ্বের দার্শনিক তত্ত্বকে একটি রহস্যময় দার্শনিক চিন্তা হিসেবে গবেষনা করেন। এতে তার বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি তার দার্শনিক চিন্তা সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। একজন সাধারণ পাঠক তার সূফী দার্শনিক চিন্তা গ্রহণ করতে পারে আবার ভিন্নমতও প্রকাশ করতে পারে। তবে তার এই রচনা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার এই কারণে যে, তিনি এর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি তার জীবন ও নৈতিকতা তুলে ধরেছেন।[৩৩]

আল ইয়াওমা আল আখির (اليوم الأخير) (পরকাল)

"আল ইয়াওমা আল আখির" এটি এমন বই যেখানে নু'আইমা বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক বিষয় গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। যেখানে জীবন, মৃত্যু, সময়, মানব অস্তিত্বের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে তার মতামত তুলে ধরেছেন। মানুষের জন্মরহস্য ও পুনর্জন্ম সম্পর্কে তার মত প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই বইটিতে তিনি একই সাথে শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মকে বর্ণনা করেন। নিজের সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পাওে না। এছাড়া সময়ের জ্ঞানও মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সময়ের কঠিন ঘূর্ননের আবর্তে ঘুরছি। সময়ের চক্র তার নিজস্বে গতিতে ঘুরছে। সময় দার্শনিকের দর্শনকে উপহাস করে, মননশীলদের চিন্তাভাবনাকে পরোয়া করেনা। সময় সময়ের মতোই গত হতে থাকে। সময়ের চক্রেই আমরা সবাই ডুবে আছি।[৩৪]

---

৩২. ড. মানাহ আল খাউরি, *মিখাইল নু'আইমা আমলাকুর রুহী ওয়াল কালাম আল মাজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৩৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭

৩৪ .হান্না আল ফাখুরি, *আল জামে ফি তারিখ আল আদাব আর আরবী আল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

সময় সম্পর্কে নু'আইমা বলেন[৩৫],

ما هي الساعة ؟ ما هي الدقيقة ؟ ما هي الثانية ؟ إنها ساعة دقيقة وثانية في عرف الالة الصغيرة التي علي معصمي . أما في عرف الزمان فهي الزمان كله ، إذ انها تتصل بكل ما كان، وما هو كائن ، وما سيكون . ولا سبيل علي الإطلاق إلي فصلها عما سبقها وعما سيلحقها . إنها الماضي في الماضي ، والحاضر في الحاض، والمستقبل في المستقبل . إنها أنا في الأمس ، والآن وفي الغد . فأنا الزمان ، والزمان أنا . لا هو يفنيني، ولا أنا أفنيه.

"ঘন্টা কী জিনিস? মিনিট কী? সেকেন্ড কী? এর বৈশিষ্ট্য কী? আমার হাতের ছোট্ট একটি মেশিনে (ঘড়ি) এক সেকেন্ড, মিনিট ও ঘন্টার সংযুক্তিতেই তৈরি হয় সময়। সময় সর্বকালের সাথেই সংযুক্ত যা অতীতে অতীত, বর্তমানে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভবিষ্যত। এটা আমিই হতে পারি আমিই গতকাল, আমিই এখন এবং আমিই আগামীকাল। আমিই সময় এবং সময়ই আমি। এটি (সময়) আমাকে ধ্বংস করে, কিন্তু আমি সময়কে নষ্ট করি না।"

তার সময় সম্পর্কে এই মতামতটি অত্যন্ত মূল্যবান ও বিস্ময়কর। যা তার সাহিত্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তিনি এ ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন যা পাঠকের চিন্তার খোরাক হয়। পাঠক যেন সেগুলো গ্রহণ করতে পারে এবং তার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

নু'আইমা আরেক জায়গায় সময়কে এক ক্ষুদ্র পোকার সাথে তুলনা করে বলেছেন, ক্ষুদ্র এক পোকা আরেকটি ক্ষুদ্র পোকাকে ভক্ষণ করে। সেখান থেকে জন্মায় আরেক পোকা। এদের খাওয়াও শেষ হয় না, জন্মও শেষ হয় না। জীবন চক্রও ঠিক একই রকম। নিজে নিজেই এ জীবনের শুরু আবার নিজে নিজেই শেষ। আদি অনন্তকাল থেকে কি এভাবেই চলতে থাকে। এটাই কি জীবনের মৃত্যু, আর এই মৃত্যুই কি জীবন?[৩৬]

---

[৩৫]. মিখাইল নু'আইমা ,"আল ইয়াওমা আল আখীর", *আল মাজমুআ আল কালিমাহ* (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৯৮৭), ভলিউম-২, পৃ. ২১-২২

[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

জীবন সম্পর্কে এমন সুন্দর, বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনা, বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক প্রশ্ন মূলত নু'আইমা'রই মতামত। যা তার সূদুর প্রসারী গবেষণা ও চিন্তার ফসল। যাতে রয়েছে জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

আরেক জায়গায় নু'আইমা মানুষ সম্পর্কে বলেছেন[৩৭]

أي كائن ، عجيب رهيب هو الإنسان . إن يكن الله أبعد من متناول العقل فالإنسان كذلك أبعد متناول العقل . وهو لن يجد طريقة إلي الله إلا إذا وجد طريقة إلي نفسه . الإنسان طريق الإنسان إلي الله . والإنسان طريق الإنسان إلي الإنسان. فما أغباه إلي يفتش عن الله وعن نفسه في غير نفسه-

"যেকোনো অদ্ভুত, আশ্চর্যের সত্তা হল মানুষ! আল্লাহ যদি যুক্তির নাগালের বাইরে হয়, তবে মানুষও মনের নাগালের বাইরে এবং মানুষ যতক্ষণ না তার নিজের পথ খুঁজে না পায়, ততক্ষন সে আল্লাহর কাছে যাবার পথও খুঁজে পাবেনা। মানুষই মানুষের কাছে যাবার পথ আর মানুষই আল্লাহর কাছে যাবার পথ। কতটা বোকা সে যে আল্লাহ ও নিজের জন্য নিজেকে ছাড়া অন্যের মাধ্যমে আল্লাহকে খোঁজে।"

নু'আইমা'র এই মতামতটি যদিও অনেক গভীর ভাবার্থ বহন করে কিন্তু এটাতে সক্রেটিস ভাবধারার সাথে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। এটি নু'আইমা'র চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সক্রেটিজম আবার এখান থেকে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) এবং দার্শনিক জ্ঞান থেকে থিওসফিক্যাল (Theosophical) চিন্তাধারায় চলে গেছে। তার বিশ্বাসের চিন্তাধারার সাথে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু তার জাদুপূর্ণ অভিব্যক্তি সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। যেখানে তিনি তার চিন্তাধারা সাহিত্য শিল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুন্দর অভিব্যক্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৩৮]

---

৩৭. হান্না আল ফাখুরী, আল জামে ফি তারিখ আল আদাব আল আরবী আল আদাব আল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

৩৮. ইনআম আল জুনদি, *আররাইদ ফিল আদাব আল আরবী* (বৈরুত: দারুল আল রাইদ আল আরাবি, ১৯৮৬), ভলিউম-২, পৃ. ৫৩৩

ইয়া ইবনে আদম (يا ابن ادم) (হে মানব সন্তান)

এই বইটি একটি কাল্পনিক কথোপকথন যা দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। “মানুষের জীবনটাই আসলে যেন কথোকপকথন” এই ভিত্তিতে লেখক এই বইটি রচনা করেন। লেখক এই বইতে জীবন, প্রেম ও মানবজীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ মানুষকে পরম স্বাধীনতা এবং সত্যিকারের সুখের জন্য সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই অস্তিত্ব ও জীবন। আল্লাহর কাছ থেকেই মানুষ তার জীবন ও অস্তিত্ব লাভ করে, যেহেতু সে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মহত্ত্ব লাভ করে।

নু'আইমা'র তার এই বইটির একটি চরিত্রের ভাষায় বলেন :[৩৯]

أجل ، يا صاحبي، لكل شيئ ضد أو نقيض ، إلا الحياة ، فهي وحدها لا ضد عنها ولا نقيض ..... الموت نقيض الولادة . كل ما يموت لكن الحياة التي أحدثك عنها لم تولد ، فكيف تموت ؟

إذن من أين جائت ؟ ومتي ؟

- هنا يا بني يخرس لساني ولسانك وكل لسان . هنا ستعطل عقلك وعقلي، وخيالك وخيالي ، وكل عقل وخيال . هذه ال " أين " وهذه ال " متي " إن هما غير علامتين في طريق الحواس والعقل الذي يتكل عليها ضمن المكان والزمان . فلا الحواس ولا العقل الذي تستطيع العمل إلا في إطار من البدايات والنهايات، أما حيث لا بداية ولا نهاية ، حيث لا "قبل " ولا " بعد" ولا " هنا " ولا "هناك " فعمل الحواس والعقل عمل لا طائل تحته -

---

[৩৯] মিখাইল নু'আইমা ,“ইয়া ইবন আদম”, *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাইন, ১৯৮৭), ৭ম খন্ড, পৃ. ২৯

“হ্যাঁ, হে বন্ধু! জীবন ছাড়া প্রত্যেক বস্তুরই বিপরীত বস্তু আছে। শুধুমাত্র জীবনেই কোনো বিপরীত বস্তু নেই। জীবন হলো একক বস্তু তার বিপরীতে অন্য কিছু নেই। মৃত্যু হলো জন্মের বিপরীত। যা কিছু জন্ম গ্রহণ করে তারই মৃত্যু হয়। কিন্তু আমি তোমাকে যে জীবনের কথা বলছি তার জন্ম হয়নি, তাহলে সে কিভাবে মৃত্যুবরণ করবে? এই জীবন কোথা থেকে এসেছে? এবং কখন এল?

-এখানে আমার ছেলে, আমার ভাষা, তোমার ভাষা এবং প্রতিটি ভাষা স্তব্ধ। এখানে তোমার মন, আমার মন, তোমার কল্পনা, আমার কল্পনা এবং প্রতিটি মন ও কল্পনাই বাধাগ্রস্থ হয়।

এই “কোথায়” এবং এই “কখন” ইন্দ্রিয় বা মন নয়। যা স্থান ও সময়ের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয় বা মনের কাজের শুরু বা শেষের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। ইন্দ্রিয় বা মনের কাজের কোনো শুরু বা শেষ নেই। যেখানে “আগে” বা “পরে” নেই, “এখানে” বা “ওখানে” নেই। তারপরে ও ইন্দ্রিয় ও মনের কাজই হলো আসাল কাজ।”

আর যারা নু'আইমা'র সাহিত্য অধ্যয়ন করে তাদের জন্য নু'আইমা'র চিন্তাভাবনা বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোকে একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত না করাই উচিত। কারণ তার কাজগুলো একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার না। কারণ তার বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যগুলো খুব উচু মানের, বিশ্লেষণগুলো খুব আশ্চর্যজনক। যেমন ইন্দ্রিয় বা মনের বিশ্লেষণ করে মনকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আবার কখনো বা মনকে অধঃপতনের কারণ হিসেবে দাঁড় করেছেন। কখনো একে মানুষের দেবতার স্থানে আসীন করেছেন আবার কখনো একে বাতিকগ্রস্থতা বা কদর্য বস্তু হিসেবে এমনভাবে ডুবিয়ে দিয়েছেন যে এর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যারা নু'আইমা'র সাহিত্যের পাঠক তারা জানেন যে, নু'আইমা'র লেখায় রয়েছে মহাজাগতিক দর্শন ও বৈজ্ঞানিক অনেক যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক মতামত ও মতবাদ। নু'আইমা সেগুলোর মাঝে বিভেদ ছাড়াই সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।[৪০]

---

[৪০] হান্না আল ফাখুরী, *আল জামী ফী তারিখিল আদাব আল আরাবী আল আদাব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৮

নু'আইমা এক বৃদ্ধের ভাষায় বলেন, "আত্মা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আত্মা এক চিরন্তন বাস্তবতার উৎস। এটি একজন ব্যক্তির মনের সবচেয়ে দুর্বল জিনিস। আবার আপনি বা আদম সন্তান অথবা যেকোন বস্তুর চেয়ে বড় যা আপনি কল্পনা করতে পারেন। অথবা যা আপনি কল্পনা করতে পারেন তার চেয়েও বড় যা আপনাকে জ্ঞানী বনায়। হে আদম সন্তান আপনার ভালোবাসা ও বিশ্বাস দিয়ে আপনি সচেতন হতে পারেন। আপনি কে? (আত্মাকে বিশ্লেষণ করে) আপনার জীবন সম্পর্কে আপনি সচেতনতা তৈরি করতে পারেন।[৪১]

এই সচেতনতা, আন্তঃসংযোগ যা প্রেম এবং বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত এবং জীবন সম্পর্কে এই সচেতনতা এই বইটির অন্যান্য অনুচ্ছেদেও লেখক বর্ণনা করেন। যা পাঠকের জন্য সহজ উপলব্ধির বিষয় নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বইটি সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার। যার তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ অনুমান বা ধারণার বাইরে।[৪২]

নু'আইমা'র এই বইটিতে তার দর্শন ও চিন্তার এক অনন্য প্রতিফলন পরিস্ফুটিত হয়েছে। এখানে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তার দর্শন ও মানবচরিত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন।

৪১.মিখাইল নু'আইমা ,"ইয়া ইবনে আদম" *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ*, (বৈরুতঃ দারুর ইলম লিলমালাইন ১৯৮৭) ৭ম খন্ড, পৃ. ৩১-৩৭

৪২. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামী ফী তারিখিল আদাব আল আরাবী আল আদাব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৭৮

কানা মা কানা (كان ما كان) যা হওয়ার হয়েছে

“কানা মা কানা” হলো আমেরিকায় থাকাকালীন মিখাইল নু’আইমা’র একটি গল্প সংকলন। এই বইটি তিনি লেবাননে ফিরে আসার পর প্রকাশিত হয়। এই বইতে ছয়টি গল্প রয়েছে। প্রথম গল্প ১৯১৫ সালে “দ্য ব্যারেন” নামে শেষ গল্পটি “কোকিল ঘড়ি” নামে ১৯২৫ সালে লিখেছিলেন। এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পই লেবানন ও আরব সমাজের সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে রচিত। বিশেষ করে নববর্ষ (سناتها الجديدة) নামক গল্পটিতে মেয়েদের জন্মের পর ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলো তুলে ধরেছেন।

“দ্যা ব্যারেন” (العاقر) এ তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বর্ণনা করেন। যা অধিকাংশ প্রাচ্যের পরিবারগুলোতে ঘটে থাকে। এ গল্পে শিশুদের জন্ম নিয়ে বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব, শত্রুতা ও নানা ভুল বোঝাবুঝি তুলে ধরেছেন।

“আয যাখিরা” (الذخيرة) নামক গল্পটিতে সমাজের আরেক শ্রেণির মানুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণ এবং পুরোহিতদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমাধান নেয় তাদের কথা তুলে ধরেছেন।

“সাদাত আল-বেক” (سعادة البيك) এই গল্পে প্রাচ্যের সেই সমস্ত মানুষের কথা বর্ণনা করেছেন যারা নিজেদের নামের সাথে দীর্ঘ লকব পছন্দ করেন। এই গল্পের নায়ক “ শেখ আহমদ আল-দাওয়াক” যিনি বাড়ির কাজ করেন। কিন্তু তাকে তার পূর্ণ নাম ছাড়া ডাকা তিনি পছন্দ করেন না।

“শুরতি” (شورتي) এই গল্পটি যারা যুদ্ধ করতে ভালোবাসে তাদের জন্যও একটি কঠোর সমালোচনা। কেননা যুদ্ধের পরিণতি কেবল রক্তপাতই নয় বরং যুদ্ধ সাথে সাথে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও ভালোবাসাকেও ধ্বংস করে। মানুষ চিরকালের জন্য সুখ, শান্তি ও মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়।[৪৩]

---

[৪৩] প্রফেসর আবদুল হালিম নদভী, *আরাবী আদব কাই তারিখ আহদী জাহেলীয়াত ছি আছরি লিহাদারিতিকা*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪৩-১৪৪

(مذكرات الأرقش) (আরকাশের ডায়েরী)

মিখাইল নু'আইমা "আরকাশের ডায়েরী" উপন্যাসের ধারণা নিয়েছিলেন নিউইয়র্কের একজন আরব ক্যাফের কর্মী থেকে। তিনি তার নাম জানতেন না। তিনি ছিলেন হালকা পাতলা ও ছোট গড়নের একজন মানুষ। তার ছিলো লম্বা ঘন কালো চুল, ঘন কালো ভ্রুর নীচে ছিলো ডাগর ডাগর মায়ারী চোখ। তবে তার চেহারার অবয়ব গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই নু'আইমা এই লোকটির নাম দেন "আরকাশ"[৪৪] (নানাবর্নে ফুটফুট দাগ করা)।

লেখক আরকাশকে তার কল্পনার মাধ্যমে চিত্রিত করেন। আরকাশের বসবাসের জগত ছিল এমন জায়গায় যা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। সে বসবাস করে এমন জগত ও জীবনে যেখানে সে দিনের পর দিন অপমানিত হতে হতে তার জীবন হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলো। তার জীবন যেন ছিলো একটি বইয়ের ফুটনোটে উল্লেখিত একটি অবহেলিত চিঠি। তবে তিনি তার জীবনের সে চিত্র, আধ্যাত্মিক চিন্তা তার ডায়রিতে লেখেন। সেখানে উল্লেখ করেন তার চারপাশের সংবেদন-শীল জগত সম্পর্কে এবং সাথে সাথে সেই জগত, যে জগত তার হৃদয় চিন্তা ও কল্পনায় ছবি আঁকে তার মধ্যে তুলনা করেন। নু'আইমা'র সমালোচকরাও এ উপন্যাসের প্রশংসা করেছিলেন।

নসীব আরীদাহ বলেছেন "আল-আরকাশ" হলো নু'আইমা'র হৃদয় থেকে উৎসরিত একটি গল্প (আমি তার রচিত আবাই ওয়াল বুনুন এর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি) "মুযাক্কারাতিল আরকাশ" হলো একটি প্রশস্ত সমুদ্রের মতো। জিবরান বলেছেন এই বইটি প্রথমে ইংরেজীতে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিলো।[৪৫] এরপর প্রথমবারের মতে ১৯৪৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

নু'আইমা'র অন্যান্য গল্প উপন্যাসের মধ্যে এই বইটি ছিলো অনেক আলোচিত ও প্রশংসিত। যার মাধ্যমে তিনি সমাজ ও বাস্তবতা তার কল্পণার চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

৪৪.মিখাইল নু'আইমা, "মুযাক্কিরাতি আল আরকাশ "*আল মাজমু'আ আল কালিমাহ*, (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিলমালাইন ১৯৮৭), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৪৩-৪৭

৪৫.মিখাইল নু'আইমা "সাবউন" *আর মাজমুআ আল কালিমাহ* (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিলমালাইন ১৯৮৭) প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭

লিকা (لقاء) সাক্ষাৎ

এটি একটি ছোট গল্পের সংকলন। ১৯৪৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এতে সাতটি ছোটগল্প রয়েছে।[৪৬]

আকাবির (أكابر) মহৎলোক

চৌদ্দটি গল্প সম্বলিত একটি সংকলন। এটি প্রথম ছাপা হয় ১৯৫৬ সালে। যার মধ্যে বিখ্যাত গল্প হলো আকাবের, নারীর শত্রু, চড়ুই পাখি ও মানুষ, গাধার পাপ ও অন্যান্য।[৪৭]

আবু বাত্তাহ্ (أبو بطة)

এটি একুশটি গল্প সম্বলিত একটি সংকলন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে বিখ্যাত গল্পগুলো হলো আবু বাত্তাহ্, নতুন জন্ম, শেষ কাগজ, ভূমিকম্প, দুই সৈনিক ইত্যাদি।[৪৮]

হাওয়ামেশ (هوامش) টিকা টিপ্পনি

এটিও একটি ছোট গল্পের সংকলন এতে ত্রিশটিরও বেশি গল্প রয়েছে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে।[৪৯]

৪৬.প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃ. ২২৫-৮৭

৪৭..প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯১-৪৭৮

৪৮.প্রাগুক্ত পৃ. ৪৭৮-৬৬০

৪৯.প্রাগুক্ত পৃ. ৩১১-৫৩১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাটকে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

মিখাইল নু'আইমা নাটকে ও অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাকে এক মহান নাট্যকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটক রচনার মাধ্যমেও তিনি অসামান্য মেধার স্বাক্ষর রাখেন। নিম্নে তার বিখ্যাত নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো-

আল আবাই ওয়াল বুনুন (الآباء والبنون) পিতা ও পুত্র

১৯১৬ সালে মিখাইল নু'আইমা নিউইয়র্কে থাকাকালীন এই নাটকটি রচনা করেন। এর ঠিক পরের বছর ১৯১৭ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই নাটকটি ১৯২৭ খৃ. থেকে এত বেশী চলছিল যে এটি পুন: প্রকাশে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছিলো। প্রথম প্রকাশে এ নাটকে অনেক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের কারণে এটি পুন: প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ভুমিকায় নু'আইমা বলেন,[৫০]

أفضل ألا أقول شيئا عن أشخاص الرواية أو عن الرواية ذاتها أكثر من أني حاولت أن الج فيها جانبا ضيقا من موضع يحوي وواسع في حياة الأمم جمعاء- وحياة شرقنا علي الأحض - وأعني الخلاف البدي بين الأباء والبنين - والتباين الدائم بين القديم والحديث-

"আমি এখানে কোনো বিশেষ মানুষ সম্পর্কে বলতে চাই না, বরং আমি জাতীয় জীবনের বিস্তৃত জীবন্ত বিষয় ও সংকীর্ণ দিক অর্ন্তভুক্ত করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ প্রাচ্যের জীবন ও জাতি বিশেষ করে পিতা ও পুত্রের মাঝে সার্বক্ষনিক বিরোধ, প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে স্থায়ী বিরোধিতা উল্লেখ করতে চেয়েছি।"

---

৫০. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামী ফী তারিখিল আদাব আল আরাবী আল আদাব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭২

নু'আইমা তার এ নাটকের মাধ্যমে প্রাচীন ও আধুনিক মন মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান তুলে ধরেছেন। উম্মে ইলিয়াছ তার মেয়ে জিনাতের বিবাহ তার পছন্দের এক ছেলের সাথে দিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু জিনাত ও তার ভাই তার মায়ের বিরোধিতাকে পাত্তা দেয়নি। নু'আইমা এই ঘটনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারাকে পুরনো চিন্তাধারার উপর বিজয়ী করেন। এভাবে তিনি নতুন প্রজন্মের সদস্যের মধ্যে উদারতা, প্রেম, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তুলে ধরেন যেখানে কোনো ধর্মান্ধতা ও স্বজনপ্রীতির অবকাশ নেই।[৫১]

সেসময় তিনি ছাড়াও অনেক প্রবাসী লেখকদের মধ্যে এই চিন্তাধারা বিদ্যামান ছিল। এছাড়াও প্রবাসী লেখকরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে স্বদেশের যেকোন বিষয়ে ও তারা একমত ছিলেন। তারা সমাজ ও সাহিত্য সংস্কারক হিসেবে সাহিত্যে অনেক নতুন ধারার প্রবেশ ঘটান। তিনি তার কাজে কৌশলী ছিলেন। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নবীদের দ্বারা। তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের অহংকারের দৃষ্টিতে দেখতেন। তার মতে তাদের ইচ্ছা বা স্বাধীনতা নাই। গৃহপালিত জন্তুর মত তারা। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে আমি কাউকে রিফাআ আল-তাহতাভী বা আল আফগানীর মতো কাউকে পাইনি। যার বিশ্বকে জয় করেছে, এবং মিশরকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। তারা সিংহাসন ও জাতিকে আলোড়িত করে দিয়েছে। তারা সমালোচনা করে এমন কোনো শব্দ বলেনি, যা মানুষের হৃদয় থেকে বিশ্বাস বা নীতি কমে গিয়েছে। তারা তাদের জাতির জন্য আশা আকাঙ্খা বহন করেছে, জাতির ক্রুশ বহন করেছে। সামনে থেকে শান্তভাবে জাতির সঠিক পথেয় দিশা দেখিয়েছেন।[৫২]

মিখাইল নু'আইমা এই নাটকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পড়ার সময়ে লিখেছেন। তখন ভাষা ও সাহিত্যে তার দক্ষতার কমতি থাকলেও তিনি যে ভূমিকা লিখেছিলেন সেখানে তিনি এটাকে সাহিত্যের নবজাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সেই জাগরণ এমন ছিলো যা অদ্যবধি শিশুর গায়ে জড়ানো কাপড়ের মতো। এবং এর কথাগুলো শিশুর অস্পষ্ট কথা বলার মতো যেখানে ঠোঁট ছাড়া কিছুই নড়ে না, জিহ্বা যেখানে আড়ষ্ট, আবেগ সেখানে সীমাবদ্ধ ও পেশীশক্তি দুর্বল।

---

৫১. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭২

৫২.প্রাগুক্ত, (A history of modern Arabic literature, m.M. Dawird: Clarendon press 1998) p-254

তিনি সাহিত্যের মঞ্চে এমনভাবে হাজির হতে চেয়েছিলেন যেন আরব বিশ্বে পূর্বে যে নবজাগরণ হয়েছে বা জাগরণের প্রাতধ্বনি হয়েছিলো তা যেন তার কাছে কিছুই না। এভাবেই প্রবাসি লেখকদের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন সভ্যতার সাথে মিশে গিয়েছিলো। সেক্ষেত্রে তারা টলস্টয় বা অন্যান্য পশ্চিমা লেখকদের সাহিত্য অধ্যয়ন করে সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিলো। তারা এভাবেই নিজেদের যোগ্যতায় নতুন বা সত্যের সন্ধান করেছে।[৫৩] নু'আইমা পুরনো ও নতুন প্রজন্মের ধারাকে নাটকের চরিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করে নতুনকে পুরনো ধারার উপরে বিজয়ী হিসেবে তুলে ধরে নিজের মতবাদকে তুলে ধরেন। সাহিত্যের নবধারা নিয়ে আলোচনা করেন।

আইয়্যুব (أيوب)

"আইয়্যুব" মিখাইল নু'আইমা রচিত একটি নাটক যা চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে এটি লেখক মূলত তাওরাতে বর্ণিত হযরত আইয়্যুব (আ) এর ঘটনাকে নাটকের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। এতে তিনি আইয়্যুব (আ) এর ধৈর্য চিত্রিত করেছেন যা একটি প্রবাদপ্রতিম উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

নু'আইমা এই নাটকটি লেখার সময় তাওরাত থেকে হুবুহু আইয়্যুব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেননি। বরং চরিত্রের প্রয়োজনে অনেককিছুই সংযোজন বিয়োজন করেছেন। সম্পূর্ণ নাটকটি তিনি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন।[৫৪] সাবলীল আরবী ভাষায় রচিত এটি নাটকটি। মিখাইল নু'আইমা'র এই নাটকটি আধুনিক আরবী থিয়েটারে অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

---

[৫৩] প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৩

[৫৪] মিখাইল নু'আইমা, "আইয়্যুব" *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৬৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জীবনী সাহিত্য ও ইতিহাসে মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

সাহিত্যের সব শাখাতেই প্রায় মিখাইল নু'আইমা'র ছিলো সফল পদচারণা। জীবনী সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় ও তিনি ছিলেন একজন সফল লেখক। নিম্নে তার কয়েকটি বই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো :

সাবউন (سبعون)

"সাবউন" অর্থই হলো সত্তর। এই বইটিতে নু'আইমা তার সত্তর বছরের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও স্মৃতিগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটিতে তিনি তার জীবনের গল্পগুলো তিন ধাপে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ধাপ : শৈশব থেকে রাশিয়ায় তার পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত (১৮৮৯-১৯১১ সাল পর্যন্ত), দ্বিতীয় ধাপ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার দেশত্যাগের শুরু থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত (১৯১১-১৯৩২ সাল পর্যন্ত) এবং তৃতীয় ধাপ: দেশে ফিরে আসার পর ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত।[৫৫]

এই বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই কারণ এর মাধ্যমে আমরা একজন মহান লেখকের জীবনের ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তিনি কেন, কখন দেশত্যাগ করেছিলেন, উদ্দেশ্য কি ছিল এবং জন্মভূমি ত্যাগ করার পর তিনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয় সবই তিনি এই বইতে উল্লেখ করেন। কখনো তিনি কাব্যিক ভাষায় আবার কখনো বা আবেগপূর্ণ ভাষায় সে স্মৃতিচারণ করেন যা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে । তার এই মূল্যবান রচনাগুলো আরবী সাহিত্যকে করেছে আরো সমৃদ্ধ।[৫৬]

৫৫.মিখাইল নু'আইমা, "সাবউন," *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ*, প্রথম খন্ড, .প্রাগুক্ত পৃ. ৯-১৬

56. Sergei A shuiskii: Same Observations on Modern Arabic Autobiography" Journal of Arabic Literature Vol Xlll PP. 111-23

জিবরান খলিল জিবরান (جبران خليل جبران)

এই বইটিতে তিনি জিবরান খলিল জিবরানকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যাতে জিবরানের সাহিত্যকর্ম, ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, চিন্তাভাবনা ও আবেগ সবকিছু সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। জীবনের শেষ পনের বছর তিনি জিবরানের জ্ঞান, তার সাহিত্যরুচি ও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সবকিছু তুলে ধরেন। জিবরানের সাথে তার ঘনিষ্ঠজনের আত্মীয়তা ছিলো বিধায় জিবরান সম্পর্কে তার জানাও সহজ ছিলো। জিবরানের চিন্তাধারা কেমন ছিলো তা তিনি এই বইতে উল্লেখ করেন।[৫৭]

যারা জিবরানের প্রশংসা করতেন বা সমালোচনা করতেন তার চেয়েও তার গুণের বর্ণনা করতেন অনেক বেশি। একজন উদীয়মান লেখক বইটি প্রকাশের পর তাকে বলেন যে, তিনি বইটি ত্রিশ বার পড়েছেন এবং প্রতিবাইই তার ভালো লেগেছে। রাশিদ আইয়ুব বলেন, "এই ধরণের বই আরো লেখা হোক।" আবদ আল মাসীহ্ আল হাদ্দাদ তাকে নিয়ে একটি ধারাবাহিক নিবদ্ধ লিখেছেন। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এর একেকটি কপি সে সময়ে পনেরো পাউন্ডে বিক্রি হয়েছিলো। এটি বৈরুত থেকে চারবার মুদ্রিত হয়। একবার দারুল হিলাল থেকে এই বইটি "কিতাব আল হিলাল" নামে মুদ্রিত হয়।[৫৮]

তিনি যখন এই বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তখন এই অনুবাদটি নিউইয়র্কের "ফিলোসফিক্যাল লাইব্রেরি" থেকে প্রকাশিত হয়। তখন আমেরিকান সংবাদপত্রগুলো এই বই নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। মেরি মেইনস বা মেরি হাসকেল ১৯ নভেম্বর ১৯৫০ সালে তাকে নিয়ে একটি নিবদ্ধ প্রকাশ করেন "সাভানা মর্নিং নিউজ" নামক একটি সংবাদপত্রে। জিবরানের জীবনে মেরি হাসকেলের একটি অনেক বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। তিনি ছিলেন অনেক গুণী একজন মহিলা তার কথা না বললে জিবরান সম্পর্কে বলা অনেক কিছুই বাদ থেকে যায়। জিবরানের শিল্প সাহিত্য চর্চার সাথী ছিলেন এই মহিলা। তিনিই সে মহিলা যার কাছে জিবরান " ব্রোকেন উইংস" (الأجنبة المتكسرة) এবং আরো কিছু প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। তিনিই

---

৫৭. মিখাইল নু'আইমা, জিবরান খলিল জিবরান, "*আল মাজমু'আ আল কালিমাহ্*" ,প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৩৪-৩৩৫

৫৮.মুহাম্মদ নুর -অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ . ৯৩

জিবরানের মৃত্যুর পর তার স্টুডিওতে থাকা তার সকল সাহিত্যকর্ম বই ও অন্যান্য লেখা তার কাছে রাখার সুপারিশ করেছিলেন। আর এ ক্ষমতা কারো থাকলে একমাত্র এই ভদ্রমহিলারই আছে। মেরি হাসকেল নু'আইমা সম্পর্কে বলেছেন "নু'আইমা ছিলেন একজন কবি, লেখক, চিন্তাবিদ ও জিবরানের অন্তরঙ্গ বন্ধু আমেরিকানদের কাছে প্রাচ্যের মানুষ হিসেবে জিবরানের জীবনের অনেক গুণই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু নু'আইমা সেটা প্রকাশ করেন। জিবরানের গোপনীয়তা ও তিনি সংরক্ষণ করেছেন। তিনিই জিবরানের জীবনের সংগ্রাম, দুর্বলতা, সাহিত্যকর্ম ও কল্পনা অনেক সুন্দর করে চিত্রিত করেছেন।"[৫৯]

এই বইতে লেখক জিবরনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংক্ষেপে সব অধ্যায়ই বর্ণনা করেন। তার জীবনকে এমনভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন যেন এক উড়ন্ত ঈগলের চলে যাওয়া। যেন একটার পর একটা ছবি আমাদের সামনে থেকে চলে যাচ্ছে।

বিশেষ করে, **১৮৮৩** সালে লেবাননে তার জন্ম হয় মাত্র রারো বছর বয়সে তিনি বোষ্টনে যান অভিবাসী হিসেবে সেখানে তিনি একজন পেশাদার শিল্পীর কাছে যান পরবর্তীতে লেবাননে পড়াশুনা করেন এবং সেখানে এক নারীর প্রেমে পড়েন। এরপর বোষ্টনে ফিরে যাওয়া, তার মা, ভাই ও বোনের মৃত্যু, মেরি হাসকেল, তার স্কুল, প্যারিসে তিন বছর অবস্থান এবং সর্বশেষ **১৯১২** সাল থেকে শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কে অবস্থান এসব কিছুই লেখক দক্ষ হাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।[৬০]

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই মিখাইল নু'আইমা'র জীবনী সাহিত্যে অবদান অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। জীবনী সাহিত্যে তিনি তার নিজের জীবনী ও অন্যান্যদের জীবনী খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫৮.মুহাম্মদ নুর -অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬, পৃ . ৯৪

৬০. মিখাইল নু'আইমা ,"সাবউন",*আল মাজমুআ আল কালিমাহ*, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৭২৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ সাহিত্যে তার অবদান

মিখাইল নু'আইমা একজন সফল প্রাবন্ধিকও ছিলেন। তার বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠক মহলে খুব প্রসংশিত হয়েছিলো। এখানে তার দুটি প্রধান প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মস্কো ও ওয়াশিংটন থেকে দূরে (أبعد من موسكو ومن واشنطن)

এই বইটি ১৯৫৭ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়় ১৯৫৬ সালে গ্রীষ্মে সোভিয়েত ইউনিয়নে তার করা একটি ভ্রমনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই বইটি লেখেন। এবং এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি এই বই রচনায় সেই দেশের কোনো রাজনৈতিক নীতির আশ্রয় নেননি। তিনি বলেন,[৬১]

إلا أنني رجل يومن أعمق الإيمان بالانسان وعبقريته التي بغير حدود ، ويؤمن بالنظام السرمدي الذي من وراء الإنسان وعبقريته، ومن وراء كل منظور في الكون، ويؤلمه أشد الألم أن يري ذلك الإنسان يغرق اليوم حتي أذنية في رغوة من المماحكات حول أيهما أفضل : الرأسمالية أم الشيوعية ؟ ثم أن تثير هذه المماحكات أخس ما فيه من شهوات ، فينسي أنه أنسان وأنه معد لتاج الألوهة-

"আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি একজন মানুষ এবং তার সীমাহীন প্রতিভাকে। এবং সেই চিরন্তন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি, মহবিশ্বের প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে যা মানুষ এবং তার প্রতিভার বাইরে। মানুষকে একটি বিষয় সবচেয়ে বেশি বেদনা দিচ্ছে সেটা হলো আজ মানুষ অনর্থক একটা বিষয়ে ডুবে আছে। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনটা ভালো পুঁজিবাদ না সাম্রাজ্যবাদ? তারপর এই দ্বন্ধের মধ্যে সে তার শ্রম ও সময় ব্যয় করছে। এবং সে ভুলে যাচ্ছে সে একজন মানুষ ও যে খোদায়ী মুকুটের জন্য নির্ধারিত।"

৬১.মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* ,৬ষ্ঠ খন্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-৫৮

নু'আইমা'র মতে, পুঁজিবাদ শেষ হলে কমিউনিজম ছড়িয়ে পড়বে। এবং এটাই মানুষকে একটি পথে টিকিয়ে রাখবে। এই "তৃতীয় শক্তিই" তাকে পরিচালিত করবে এর ফলেই হবে উন্নয়ন আর এখান থেকে বিচ্যুতি হলে হবে পতন। এর ফলেই হবে উন্নয়ন আর এই ব্যবস্থার বিপরীত ফল হবে মন্দ। মিখাইল নু'আইমা একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবেই দেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি মহাজাগতিক ব্যবস্থাকে দেখেন। তখন এই বিশ্বে একটি সর্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে। যার কোনো সীমানা ও বাঁধা থাকবে না।

একটিই মতবাদ যা ধর্মের শিকড়ে আটকে আছে। একটিই মতবাদ থাকবে সেটা হলো মানব জাতীয়তাবাদ। তিনি বলেছেন: "যখন সমগ্র বিশ্ব এক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তখন মানুষের মত শান্তির আশাও মহান হবে, মানুষ পৃথিবীকে মহাকাশের মত পরিণত করতে সক্ষম হবে। কেননা আলাদা আলাদা রাজ্য মানেই আলাদা আলাদা অনেক সীমানা, আর ভিন্ন ভিন্ন সীমানা মানে অনেকগুলো যুদ্ধের কারণ।"[৬২]

(زاد المعاد) (পরকালের পাথেয়)

এটি বক্তৃতা, ভাষণ, লেকচার ও বিভিন্ন কথোপকথনের একটি সংগ্রহ। যেখাখে তিনি মহাবিশ্ব, মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্ত করেছেন। মানুষের প্রভুত্ব ও অস্তিত্বের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। জোর দিয়েছেন সেই সভ্যতার যা মানুষের মধ্যেই রয়েছে, সেই জ্ঞানের উপর যা মানুষের নিজের জ্ঞান।

এই বইতে অনেকগুলো অধ্যায় আছে । যেখানে নু'আইমা'র দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম "কল্পনা" (الخيال) মূলত এক ভাষণ। যেটি তিনি বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন। এ ভাষণে তিনি নিজেকে প্রত্যাখানকারীর অবস্থানে রাখেন। সবসময়ই তার মাঝে এধরণের বৈশিষ্ট্য ছিলো। তার বৈশিষ্ট্য ছিলো এরকম যে, যেকোনো বিষয় তিনি নিজের কল্পনার জগতের চিন্তা অনুযায়ী ভাবতেন তা যদি সাধারণ মানুষের নিয়মের বাইরে যেত তাও নিজের কল্পনাতেই আবদ্ধ থাকতেন।

৬২.হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখ আল আদাব আল আরবী আল আদাব আল হাদীস*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭৮-৮০

তার মতে মানুষ যে মনকে সম্মান করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তা আসলে একটি বন্য ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মানুষে সমস্ত নির্ভরতা মনের উপর ছেড়ে না দিয়ে শর্ত থাকতে হবে কেননা কল্পনাই হলো মশালবাহক। আমাদের চারপাশে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে মশালবাহক হলো কল্পনা। এটি অসীম অস্তিত্বের পথে পথপ্রদর্শক, বাস্তবতার দিকে একমাত্র সঠিক পথের সন্ধানদাতা, তার মতে যা মানুষ কল্পনা করে বাস্তবে তাই হয়। আর যা মানুষ কল্পনা করে না তা বাস্তবেও হয় না এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নু'আইমা'র এই কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টির চিন্তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। তবে কখনো কখনো তার এ কল্পনা পবিত্র বাইবেলের অনুকরণে ছিল। বক্তৃতাটি যদিও ইংরেজীতে ছিলো, কিন্তু তাতে তেমন কোনো বক্তৃতার ভঙ্গির তিনি প্রকাশ করেননি। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার বক্তৃতার ভাষা ছিলো মনোমুগ্ধকর, কল্পনাশক্তি ছিলো অসম্ভব প্রখর, অভিব্যক্তির প্রকাশ ছিলো খুবই আকর্ষণীয়। যা শ্রোতাকে আনন্দিত করে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে তার কল্পনাকে এমনভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন যে, শ্রোতা নিজেক নু'আইমা'র কাছে সমর্পণ করে এবং তার চিন্তা বা কল্পনা অনুযায়ী নিজেও কল্পনা বা চিন্তা করতে থাকে। তিনি বলেন, কল্পনাকে কোনো অজুহাত, প্রমাণ বা যুক্তি দিয়ে ভাবতে যাবেন না বরং কল্পনার জগৎ হবে নিজস্ব ও যুক্তিহীন।[৬৩]

---

[৬৩] .প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৩-৩৭৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পত্র সাহিত্যে তার অবদান

মিখাইল নু'আইমা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখালেখি করার সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পত্রও লিখতেন প্রায় নিয়মিত। তার অনেক সহকর্মী, কবি, লেখক, চিন্তাবিদ ও পত্রিকায় চিঠি পাঠাতেন। কিন্তু তার চিঠিগুলো সাধারণ মানুষের চিঠির মতো ছিলোনা। তিনি সেখানে তার দার্শনিক, সাহিত্যিক মতামত বিনিময় করতেন। চিঠিগুলোও লিখতেনও সাহিত্যিক ভাষায়। অনেক চিঠিতে তার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার অনেক কিছু উল্লেখ ছিলো। তবে নু'আইমা যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন সেগুলোর কোনো কপি তার কাছে ছিলো না। যখন তার অনেক পাঠক তার চিঠিগুলো প্রকাশ করার দাবি জানান, তখন তিনি সেগুলো খুঁজতে থাকেন। এবং সেসময় তিনি সংবাদপত্রে এ মর্মে লেখাও প্রেরণ করেন, যেন যাদের কাছে তার লিখিত চিঠিগুলো আছে তারা যেন সেগুলোর কপি তাকে ফেরত পাঠায়। কিন্তু অধিকাংশ চিঠিই তিনি আর ফেরত পাননি। যার কারণে তার চিঠিপত্রের একটা বড় অংশ অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এই চিঠিপত্রগুলো ও তার সকল রচনাবলী একটি সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়, যা "আল মাজমু'আ আল কালিমাহ" নামে পরিচিত। এর আটটি খন্ড রয়েছে।

নু'আইমা তার চিঠিতে শুধুমাত্র ভাবের আদান প্রদানই করতেন না। বরং সাথে সাথে শিল্প সাহিত্যের অনেক মতামত ও দরকারী তথ্য আদান প্রদান করতেন। উদাহরণস্বরূপ সম্মানিত শিক্ষক ফুয়াদ আল খাশেনকে লেখা তার (سوار الياسمين) " দ্য জেসমিন ব্রেসলেট" হলো এমন একটি ছবি, কাব্যিক সুরের সংগ্রহ ও ধাঁধা বোঝার জন্য জ্যেতিষীদের কাছে যাবার প্রয়োজন নাই। বরং তার ভাষা ছিলো জাদুকরের যাদুর মতো।[৬৪]

---

[৬৪] মিখাইল নু'আইমা, "রাসাইল", *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* ,অষ্টম খন্ড, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৫

আরবী সাহিত্যে তার অবস্থান :

মিখাইল নু'আইমা'র আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার অবদানের আলোকে আমরা তাকে কবিতার নাইটদের নাইট হিসেবে দেখতে পাই। আবার তাকে সংস্কারবাদী হিসেবেও দেখতে পাই। তার লেখার মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের হৃদয়ে তার স্থান করে নিয়েছেন। পশ্চিমা বিশ্বেও তার লেখা অনেক প্রশংসিত ছিলো। ১৯৭৮ সালের মে মাসে লেবাননে মিখাইল নু'আইমাকে সম্মান জানিয়ে একটি উৎসবের আয়োজন হয়েছিল যাতে আরব ও বিদেশী লেখকদের একটি দল অংশ নিয়েছিল। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে (সিয়াটেল) ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন এ অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে তার জন্য একটি বিশেষ সিম্পেজিয়ামও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় গবেষকরা করা নু'আইমা'র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও সমালোচক হিসেবে তার অবদান তুলে ধরেন। সাথে সাথে কবি, গল্পকার, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ হিসাবেও তার রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়। এ সিম্পোজিয়ামে ড. নাদিম নু'আইমা দেশে ও প্রবাসে আরব লেখক ও সাহিত্যিকদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন।[৬৫]

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে নু'আইমা ছিলেন এক মহান লেখক ও আরব বিশ্বে আরবী সাহিত্যের নবজাগরণের জন্য যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন লেখক। তিনি গদ্য লেখার ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রেখেছেন। যেখানে ছিলো তার নিজস্ব সৃজনশীলতা ও ভাষার মাধুর্যতা। তার রচিত সাহিত্য ছিলো জীবন ও বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত সাহিত্য। তার লেখায় মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ, আশা, হতাশা নানা দিক তুলে ধরেছেন। আবার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক নানা বিষয় যেমন মাহবিশ্ব, মানুষ, মানুষের আত্মার অবস্থান সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ নিয়েও তিনি লিখেছেন। তিনি রাজনৈতিক ইস্যুতে না লিখে সমাজ ও প্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন।[৬৬]

---

[৬৫] ড. মানাহ খাউরি, *মিখাইল নু'আইমা আমলাক আর রুহী ওয়াল কালাম*, অধ্যায়- ২১২, পৃ. ২৭

[৬৬] হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখ আল আদাব আল আরবী আল আদাব আল হাদীস*, পৃ. ৩৭৮-৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে সমালোচনার ধারা

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরবী সাহিত্যে সমালোচনার ধারা

সাহিত্য সমালোচনা হচ্ছে সাহিত্যের গবেষণা, আলোচনা, মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা এই সবকিছুর সম্মিলন। আধুনিককালে সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগ করা হয় । সাহিত্য তত্ত্বকে সাহিত্য সমালোচনায় পদ্ধতি ও লক্ষ্যের দর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। যদিও সাহিত্য তত্ত্বের চর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা একে অপরের সাথে জড়িত। সাহিত্য সমালোচক মাত্রই যে সাহিত্যের তাত্ত্বিক এ কথা বলা যায় না, তবে অনেকেই সাহিত্য সমালোচনাকে সাহিত্য তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ বলেই মনে করেন।[১]

সাহিত্য সমালোচনা কি :

সমালোচনা কি সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণির মতো সৃজনশীল, অর্থাৎ সমালোচনা কি প্রকৃতই সাহিত্য পদবাচ্য? অনেকেই সমালোচনাকে সাহিত্যকর্ম বলে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন এবং সমালোচকও স্রষ্টার সম্মান পান না। এ কথা ঠিক যে, কাব্য কবিতা, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির যে মৌলিকত্ব তা সামলোচনা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে একজন কবি বা লেখক যেমন তার কল্পনার সৌন্দর্যে, তাঁর আবেগের উষ্ণতায় জগৎ ও জীবনের সত্যকে রূপদান করেন। একজন সমালোচকও তেমন একটি সাহিত্যকর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন, পাঠকবর্গের মানে বিস্ময় সৃষ্টি করেন, যা মূল রচনাকে বুঝতে সাহায্য করা ছাড়াও পাঠককে সাহিত্যপাঠে উৎসাহিত করে। এই সমালোচনা বা মূল্যায়ন একটি নতুন সৃষ্টি। সাহিত্য বা অন্যকোনো শিল্পকলার সংজ্ঞা দান গানিতিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। যা সম্ভব তা হলো, ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে কাছাকাছি ধারনায় পৌঁছা। তাই সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনাকে বোঝার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ জটিল পথযাত্রা। সাহিত্য সমালোচনা মানে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে নতুন করে আবিস্কার বা পাঠোদ্বার করা। এটা একধরনের মূল্যায়ন, কিন্তু তা সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্য দিয়ে সাহিত্য দর্শনের পদ্ধতি।

---

1. https://bn.wikipedia.org/wiki/ সাহিত্য- সমালোচনা

সাহিত্যের সামগ্রিক গন্তব্য বা ঠিকানায় নান্দনিক রূপ বিশ্লেষণ করার নামই সাহিত্য সমালোচনা। সরলীকরণ অর্থে বলতে পারি, সাহিত্যের ভালোমন্দ, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য, উৎকর্ষ-অপকর্ষের সম্যক আলোচনা হলো সাহিত্য সমালোচনা। সম্যক আলোচনা মানে সহিত্যের ভাব, বস্তু, রীতি অলঙ্কার ও স্রষ্টার বিশেষ মানষ সৃষ্টির সামগ্রিক আলোচনা।

এ ব্যাপারে মিলটন মারি বলেছেন : If it giver this delight, criticism is creative, for it enables the reader to discover beauties and significances which he has not seen, or to see those which he had himself glimpsed in a new and revealing light.[2]

একটি সাহিত্যকর্মের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পটভূমি লেখকের ব্যক্তি জীবন ও তার সঙ্গে সমকালীন সমাজ জীবনের সম্পর্কের বহু কৌনিকতা, শিল্পরূপ আঙ্গিক, ভাষা ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য, সামগ্রিকভাবে তার বিষয়গত তাৎপর্য তথা নান্দনিক সার্থকতা এ সব কিছুই আন্তরিকভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয় সমালোচককে। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা পর্যালোচনা থেকে তিনি যা উপলব্ধি করেন তাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে হয়।

সাহিত্য সমালোচনা হলো সাহিত্যের কোনো কাজের মূল্য বিচার করা। সহিত্যিক সমালোচনার কোনোও নির্দিষ্ট কাজ বা কোনোও কাজের একটি দেহকে তার নান্দনিক মান, কাজের ঐতিহাসিক, সংস্কৃতিক অনুযায়ী মূল্যায়ণ করা হয়।

আধুনিক সমালোচনার প্রামান্য পুরুষ টি এস এলিয়ট বলেছেন, সমালোচনার কাজ দুটো এক শিল্পকর্মের উদ্ভাবন (the education of work of art) দুই রুচিবোধের সংশোধন (the correction of taste). যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটি রচনা সম্পর্কে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হয়। এবং সমালোচনার মধ্যে নিহিত মূল্যবোধ ও যুক্তিতর্কের কারণে সমকালীন রুচির মধ্যে পরিবর্তন আসে।

---

2. https://www.millioncontent.com/2021/09/blog-post_738.html

তার সমালোচনার কারণে সমকালীন কবিদের কবিতা সম্পর্কে কাব্যপ্রেমীদের

তার সমালোচনার কারণে সমকালীন কবিদের কবিতা সম্পর্কে কাব্যপ্রেমীদের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছিল, এবং সমকালীন এক বিশাল কবিগোষ্ঠীর রুচির মধ্যে পরিবর্তন এসেছিলো।

সাহিত্য হলো মানষের সুচিন্তিত ভাবনা, কল্পনায় সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ। তাই সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মানুষ তার চিন্তা ও কল্পনাশক্তির উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে সাহিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের ভেতরে আলাদা একটি জগত সৃষ্টি করে। এবং এর মাধ্যেমে মানুষ তার নিজের ভেতর একটি শুদ্ধ ও পরিশীলিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। তাই মানুষ মাত্রই সাহিত্যের প্রতি এক অসীম আকর্ষণ বোধ করে থাকে।

সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে একজন পাঠক এর রস আস্বাসন ও আনন্দ উপভোগ করে থাকে। হোক সেটা গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে মানুষ অবসর বিনোদন বা মনের খোরাক সংগ্রহ করে। লেখক একটি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে। একটি সাহিত্য এক যুগ থেকে অন্যযুগের মানুষের মধে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

তবে লেখকের সব রচনাই যে পাঠকের ভালো লাগবে ব্যাপারটা তেমন নয়। কখনো কোনো রচনা পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে। একজন মানুষের ভালো না লাগার মধ্যে রয়েছে সমালোচনার বিষয়টি। আর এখান থেকেই মূলত সমালোচনা সাহিত্যের উৎপত্তি। এবং এ নিয়েই সাহিত্য নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে তুলেছে। সমালোচনা সাহিত্য Criticism বা সামালোচনাকে মার্কিন গ্রে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে The interpretation, analysis, Classification, and ultimately the judgment of work of literature, which has becomes a kind of literary genre itself. [3]

তবে একেবারে সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে সমালোচনা অবশ্যই হতে হবে । একজন সমালোচকের তার ব্যক্তি মানসের ভাবনার সাথে সামলোচনাকে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। ব্যক্তিগত কারণে সাহিত্য সমালোচক হতে পারে না।

3.https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/shahitto-shamoiki/94479/

প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। সে হিসেবে একজন লেখক ও সামালোচকের বোধ ও ধারণায় মিল হবে তা কিন্তু নয়। আর তখনই সমালোচক ও লেখকের মত পার্থক্য, তিক্ততা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। আর এমন পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা ব্যক্তিগত আক্রোশ ও রসবোধের অভাবের কারণে বৈরী পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়। Richard Dutto সমালোচনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, The undenstanding and appreciation of literary texts.[4]

সমালোচনায় বস্তুনিষ্ঠতাই কাম্য। আরবী সাহিত্য সমালোচনা আব্বাসী যুগে শুরু হলেও আধুনিক কালে এর পূর্নাঙ্গ সফলতা আসে। তবে বর্ণনাধর্মী কিংবা বিশ্লেষনমূলক রচনা অন্যান্য সহিত্যের মতো আরবী সাহিত্যের প্রারম্ভেও লক্ষ্য করা যায়। ব্যাকরণ-শাস্ত্র, কবিতা, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমেই সমালোচনার সূচনা ও বিকাশ, বর্তমানে আরবী সাহিত্য সমালোচনা সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সমালোচকের বৈশিষ্ট্য :

সমালোচক একটি শিল্পকর্মের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিক দিয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা করেন। একটি রচনায় ভাব বিষয়বস্তু ভাষার প্রয়োগ, রচয়িতার দৃষ্টি ভঙ্গির, মানসদৃষ্টি এবং রচনাশৈলীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তার ভালোলাগা না লাগাকে যুক্তিগ্রাহ্যতার সাথে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সম্যকভাবে ব্যক্ত করেন। সাহিত্য রচনা ও পাঠ বা অনুশীলনের পর সমালোচক শুরু করেন সাহিত্যের মূল্যবিচার। এ পর্যায়ে সমালোচক শিল্পের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ খুটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে তারঁ সমালোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

সাহিত্য সমালোচকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "সমালোচনার কথায়" এভাবে বলেছেন[৫] ব্যক্তিগত ভালোলাগার ভাবোচ্ছ্বাস বা ভালো না লাগার নিরুচ্ছ্বাস ব্যস্ত থাকবেন না। সমালোচক যতসম্ভব নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বিচার এমনভাবে প্রবৃত্ত হবেন যাতে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের পরিচয়গত কোনো বাধা, কোনো আরোপিত নিয়মকানুনের বাঁধন না পড়ে।"

---

4. প্রাগুক্ত

5. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/chonchalmahbub/30040229

তাই একজন উত্তম সমালোচক তার ব্যক্তিগত সংস্কার, পান্ডিত্যের অহমিকা দ্বারা পরিচালিত হন না। তিনি দায়িত্বশীলতার সাথে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবেন সাহিত্যের গুণাগুণ। এই জন্য তাঁকে শিল্প ও সাহিত্য জগতের মূলনীতিগুলো গভীরভাবে জেনে তারপর নিজেকে নিয়োজিত করতে হয় সমালোচনার কাজে। তিনি বিচক্ষণতার সাথে সাহিত্যের তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয়ে যুক্তি বিচার বিবেচনা দ্বারা পাঠকের মধ্যে আলোচিত সাহিত্য কর্ম নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি আরো বলেছেন সমালোচকের মধ্যে দশটি গুনের সমাবেশ থাকতে হবে। সে দশটি গুণ হলো ভূয়োদর্শন, আত্মসমালোচনা, সতর্কতা ও পরমসহিষ্ণুতা। লেখকের প্রতি সহানুভুতি, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, দার্শনিক অন্তদৃষ্টি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, যৌক্তিকতার প্রতি নিষ্ঠা, নিস্পৃহতা লেখকের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত হবার স্বাভাবিক সামর্থ।

কাব্য-কবিতা গল্প উপন্যাসে যে মৌলিকত্ব, সমালোচনা সাহিত্যে তা নেই। তাই সমালোচক ও সমালোচনা সাহিত্যের একটি অন্যতম স্তম্ভ হলেও অনেকেই সমালোচনাকে সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায়না, একজন সমালোচককে সৃষ্টিশীলতার জন্য যথাযথ সম্মান দিতে চান না। একজন কবি– প্রাবন্ধিক বা উপন্যাসিক যেমন তার কল্পনার নান্দনিকতা, আবেগ, ভালোবাসা ও রোমান্টিকতার রূপ দিয়ে থাকেন তেমনি একজন সমালোচকও একটি সাহিত্যকর্ম এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে পাঠকের বিস্ময় সৃষ্টি করে তাদের আনন্দের যোগান দেন।

কিন্তু সাহিত্য ও সামলোচনা সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহিত্য লেখকের সৃষ্টি হলেও সমালোচনা মূল সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল। তবে একজন উত্তম সমালোচক তার মনের মাধুরী মিশিয়ে মূল লেখকের মতোই সমালোচনাকেও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য আকর্ষণীয় করে তোলেন।

বিশেষ কোনো আবেগ, কোনো সৃজনী উদ্দীপনা ও মন মননের বিন্যাস থেকে একটি সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি হয়। সেই মানসিক উদ্দীপনা বা লেখার মূল রহস্য বোঝার জন্য একজন সচেতন পাঠকেরও দরকার হয়।

একজন সমালোচক মূলত সেই সচেতন, সতর্ক, বোদ্ধা পাঠক যিনি শিল্পকর্মটিকে তার সামগ্রিকতা বুঝে যাচাই বাছাই ও ব্যাখ্যা করেন। এই বিবেচনায় একজন সমালোচককে হতে হয় খুবই জ্ঞান সম্পন্ন। তাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে সমালোচনা করা উচিত। সমালোচনা যেন শুধুমাত্র নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা আমিই বেশি জানি এমন মনোভাব হওয়া উচিত নয়।

সমালোচনার আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত লেখক ও সমালোচকের মধ্যে বিরোধ ও অবিশ্বাসের এক অদৃশ্য কাঁচের দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে। এটা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। এর জন্য দায়ী উভয় পক্ষই। লেখক যেমন সমালোচকের নেতিবাচক সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না, তেমনি কোনো কোনো সমালোচকও সাহিত্যক্ষেত্র বিভিন্ন রচনার ইতিবাচক দিকগুলোর চেয়ে নেতিবাচক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিতে গিয়ে এবং নিজের জ্ঞানের পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে লেখকের মূল রচনাকে কখনো কখনো অখাদ্য কুখাদ্য বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তাই অপরদিকে লেখকও তখন সমালোচকের বিদ্যার দৌড় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।[৬]

সমালোচনার সংস্কৃতি সমাজ বা রাষ্ট্রে সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। সমালোচনার মাধ্যমে গড়ে ওঠা একজন মানুষ পরিশীলিত, আদর্শবান উচ্চ মননশীল হতে বাধ্য। এ বিষয়টি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে একজন সমালোচকের দায়ও কিন্তু অনেক। একজন মেধাবী, সৃষ্টিশীল ও প্রতিভাবান সমালোচককে যে কোনো শিল্প মাধ্যম বা শিল্পীর মৌলিক প্রতিভা যতটা উৎকর্ষ মানের বা কতটা নিকৃষ্ট বা নিচু মানের তা ব্যাখ্যা করতে হয় তাত্ত্বিকভাবে। বিশ্লেষণ করতে হয় তার আভিজত্য, দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা এবং ভুল ত্রুটিকে, সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় ভাষা ও সাহিত্যের সব ধরণের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই। তবে তা করতে হবে যথেষ্ট যুক্তি গ্রাহ্যতার মাধ্যমে। এখানে আবেগ, পক্ষপাতদুষ্টতা আক্রমন বা অধিক পাণ্ডিত্য দেখানোর কোনো অবকাশ নেই।

6..https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/shahitto-shamoiki/94479/

শুধুমাত্র একজন প্রকৃত ও ন্যায়নিষ্ঠ সমালোচকের সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্রে শুদ্ধ ও পরিশীলিত সাহিত্য সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠতে পারে। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনার বিভিন্ন ধারা রয়েছে। সমালোচকগণ বিভিন্ন দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থান থেকে সাহিত্যকে বিচার করে থাকেন। কিন্তু সব সমালোচকগন এ সমালোচনার ব্যাপারে একমত হয়েছেন খুব কম কারন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাহিত্যের সৌন্দর্য শিল্প গুরুত্ব প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকেন নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান তাঁদেরকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলে।

একজন সমালোচকের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও রুচিবোধের গুণে-গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় সমালোচককে উত্তম সমালোচনার জন্য অন্য ভাষার সাহিত্যও জানা প্রয়োজন। সাহিত্য সমালোচনা দর্শনসহ বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়ম কিছু দর্শনশাস্ত্র মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকে নেয়া। তাই একদল পণ্ডিত বলেন যে, একজন সমালোচকের উচিত সাহিত্য বিষয়ক বিষয়গুলো সমালোচনা করা। পাঠকের রুচি অনুযায়ী বিতর্কিত বিষয় বাদ দেয়া। অপর একদল পন্ডিত বলেন, সমালোচকের কাজ হবে সাহিত্যবিষয়ক রচনার সুন্দর বা অসুন্দর বিবেচনা করা।[৭]

আবার কখনো কখনো কোনো সাহিত্যের সমালোচনা করতে হলে সেই লেখকের জীবনী সম্পর্কেও জানতে হয়। কেননা কখনো কখনো কোনো কোনো সাহিত্যকর্মে লেখকের জীবনের প্রভাবও থাকে। বিশেষ করে কাসিদা (গীতিকাব্য) ও অন্যান্য কবিতায় এ ধরণের প্রভাব বিদ্যমান।

রুচিবোধের উপর নির্ভর করে সাহিত্য সমালোচনা একজনের রুচিবোধের চেয়ে অন্যজনের রুচিবোধ উৎকৃষ্টমানের হতে পারে। তবে একসকল সমালোচকের মধ্যে অনেক সময়ই ঐক্যমত দেয়া যায়।

---

৭. আহমদ আমীন, *আল-নক্দ আল-আদাবী*, ১০খণ্ড, ৫ম সংস্করণ (কায়রো: মাকতাবা আল-নাহদা আল-মিসরীয়্যা, ১৯৮৩) পৃ. ১-১৯

সাহিত্য সমালোচনায় নানা দিক রয়েছে। এমনও অনেক দিক রয়েছে যা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যেমন বিভিন্ন সাহিত্যকের ব্যক্তিত্ববোধ। আবার অনেক নিয়ম সাধারণ বিবেক বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। সমালোচনা মানে এই নয় যে, যুক্তিহীন দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো। তাই একজন সমালোচককে অব্যশ্যই সাহিত্য সমালোচনার নিয়মকানুন মেনেই সাহিত্য সমালোচনা করা দরকার। একজন সমালোচকের মাত্রা, পরিমাণ, ছন্দ,মিল অলংকার এ সকল সাধারণ পরিভাষা জানা প্রয়োজন।[৮]

সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রীক মহাকবি হোমারের রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' নামক মাহকাব্যদ্বয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি মহাকাব্য সাহিত্য সমালোচনার উৎস হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। এই দুটি গ্রন্থ থেকেই সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা হয়।

সমালোচকের নিজস্ব পছন্দের কারণে কখনো কখনো কোনো রচনা বা তার লেখক সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় উচ্ছ্বাস দেখাতে দেখা যায়। তাই এর কোনোটাই আদর্শ সমালোচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। একজন সমালোচক তার অনুশীলনের মাধ্যমে পর্যালোচনার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটাবেন, যাখুবই স্বাভাবিক বিষয়। সমালোচকের এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে তার ব্যক্তিগত রুচি, ভালো মন্দ লাগার ভিত্তিতেই একটি সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ণ নির্ধারিত হবে না। সমালোচকের থাকতে হবে উদারতা, সহৃদয়তা এবং সর্বোপরি রসবোধ, তা না থাকলে একটি শিল্প সাহিত্যের আনন্দ ও নান্দনিকতা যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত হবে না।

---

৮. মো: আবু বকর সিদ্দীক, *আরবী সাহিত্যে সমালোচনা*,(ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী,ডিসেম্বর ১৯৮৯) পৃ. ৪৫

কিভাবে সাহিত্য সমালোচনা করতে হবে

সাহিত্য সমালোচনা বিদ্যা হলো সাহিত্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। অর্থাৎ সাহিত্যের আলোচনা, গবেষণা ও ব্যাখ্যাই হলো সাহিত্য সমালোচনা। সাহিত্য সমালোচনা হলো একটি সাহিত্যকর্মের যথাযথ নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান। এই সমালোচনা সাধারণত ছাত্র পন্ডিত গবেষক এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে যে কেউ সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে সমালোচনা করা উচিত। এজন্য সাহিত্য সমালোচনা করার পূর্বে সাহিত্য সমালোচকের কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন:

১.পাঠ :

সমালোচনা করার বিষয়টি খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। গভীর মনোযোগ দিতে হবে শিরোনামের উপর। যাতে করে শিরোনাম থেকে মূল বক্তব্যটা কি সেটা বুঝা যায়। লেখায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো বারবার পড়তে হবে এবং তার অর্থ ও বুঝতে হবে।

২. লেখার উপাদানগুলো নিরীক্ষা :

***প্লট বা কাহিনী :** লেখার মূল হলো প্লট বা কাহিনী। লেখার প্লট বা কাহিনী বা কি উদ্দেশ্যে লেখা সেটা অনুধাবন করা।

***বিন্যাস :** কাহিনী লেখার সময়, স্থান, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ অনুধাবন করা।

*** চরিত্র :** প্রধান ও পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকা বা কাজ কি তা খেয়াল করা।

***লেখার দ্বন্দ্বের সমাধান :** লেখায় যদি কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিষয় থাকে সেখানে লেখক সুন্দরভাবে তার সমাধান দিতে পেরেছেন কিনা তা বুঝা।

***মূলভাব :** লেখার মাধ্যমে লেখক কী বিষয় বোঝাতে চেয়েছেন তার মূলভাব উদ্ধার করতে হবে।

*** দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিভঙ্গি :** লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খেয়াল করে চরিত্র ও লেখকের ভাবনা আলাদা কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে।

৩. **সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা তৈরি করা :** লেখক যেটা বোঝাতে চেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে একটি সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা তৈরি করতে হবে।

৪. গবেষণার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে সমালোচনা তুলে ধরা উচিত।

৫. **সুন্দর সমাধান :** গবেষণার মাধ্যমে মূল লেখার সমালোচনা করে লেখাটি কেমন হতে পারতো তার একটি সুন্দর সমাধান দিতে হবে।

একটি পাঠ সমালোচনার জন্য সমালোচককে সেই পাঠটি বারবার পড়ে সতর্কতার সাথে সমালোচনা করতে হবে। যাতে করে লেখার মূল কাহিনীর কোনো পরিবর্তন না হয়। কেননা একজন সমালোচকের কাজ হলো সাহিত্যের মূল্যায়ণ করা, কাহিনীর রূপরেখা নির্ধারণ করা নয়। মূলত একজন সাহিত্য রচয়িতা ও সাহিত্য সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। একজন প্রকৃত সমালোচকের দায়িত্ব বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধে বলেছিলেন, "সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথমত, বিষয়ের উপর সাহিত্যিকের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়ত, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।"[৯] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলতে চেয়েছেন। একজন সমালোচকের অবশ্যই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়বস্তু বলতে তিনি সাহিত্যেকের অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতাকে আর আঙ্গিক বলতে বুঝিয়েছেন সেই গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ।

---

[9] https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6699

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস

আরবী সাহিত্য সমালোচনা মূলত প্রাক ইসলামী যুগে শুরু হয়েছিল। জাহেলি যুগ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগে আরবী সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্টতম রচনাগুলো রচিত হয়। সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এই যুগে। সাহিত্যের ব্যাপক কদর ও চর্চা হলেও এই যুগে সাহিত্যের নানা শাখা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেনি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বিষয়ের চর্চা হয়েছিল। তেমনি একটি শাখা হলো 'নাকদ' তথা সাহিত্যসমালোচনা। তবে সমালোচনা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছে অনেক পরে। জাহেলি যুগে সমালোচনা সাহিত্য এই নামে সাহিত্যে শুরু না হলেও কিছু সমালোচনা এই যুগেই শুরু হয়েছিলো।[১০]

জাহেলি যুগে সাহিত্য সমালোচনার কিছু নমুনা নিম্নরূপ :

* উকায মেলায় বড় বড় কবিদের সভমনে কবিতার ভালো মন্দ দিক নির্নয় করা হতো।

*মুয়াল্লাকার নিয়ে আলোচনা করা হতো।

*কাবার দেয়ালে শ্রেষ্ঠ কবিতা ঝুলিয়ে রাখা হলো। এভাবে কবিতার ভালো মন্দ দিক নির্ণয় করা হতো।

*জাহেলি যুগে প্রধান সাহিত্য সমালোচক ছিলেন নাবিগা আয যুবইয়ানী। তার একটা নির্দিষ্ট তাবু ছিলো, যেখানে কাব্য সমালোচনা হতো ও কবিদের নিয়ে নানা জলসা বসত।

*উকায মেলায় কবিদের কবিতার প্রতিযোগীতা হতো। সেইসব কবিতায় সমালোচনা করতেন আয যুবইয়ানী।[১১]

অর্থাৎ জাহেলী যুগেও সাহিত্য সমালোচনা ছিলো। যদিও এতটা সুশৃংখল বা সাজানো ছিলো না।

---

10. https://infobd266.blogspot.com/2021/12/blog-post_75.html

১১.প্রাগুক্ত.

তবে সেসময় সমালোচনাটা ছিলো সরাসরি। সরাসরি সম্মুখে কবিতা পাঠ করার পর কার কবিতা ভালো সেটা বলে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হতো। আর অন্যদের কবিতার ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া হতো।

আরবী সহিত্যের প্রথম সমালোচনা এভাবে কবিদের মূল্যায়ণের মাধ্যমে হয়। তাছাড়া এ সময় সাধারণ লোকদের সমালোচনাও সংরক্ষণ করা হতো । যা কবিতা শুনার জন্য বিভিন্ন বার্ষিক মেলা, বাজার এবং সভায় একত্রিত হতো।

সমালোচনা শুধু ভাষা ও রচনাশৈলীর বিষয় নয়। কোনো বিষয়ে কবির বাস্তব, সঠিক জ্ঞানের বিবেচনা করে ও তাঁর কবিতার বিচার কারা হয়। তাই প্রাক ইসলামী যুগে কবিতার সমালোচনা শুধু প্রাকৃতিক রুচিবোধের উপর ভিত্তি করে হতো। এই রুচিবোধ বিভিন্ন বাজার, সভা বা শাসকদের সামনে কবিদের পেশ করা কবিতার উপর হতো। কবিদের ভাষা গোত্র মর্যাদা, প্রশংসা বা শাসকশ্রেণীকে খুশি করার উপরে কবিদের মূল্যায়ণ হতো।[১২]

সেসময় কাব্যধর্মী দর্শন ও সমালোচনার চিন্তাধারা ছিলো জুহায়ের ও নাবিগার মধ্যে এবং সাথে সাথে অন্যান্য প্রাক ইসলামী কবিদের মধ্যে।[১৩] এ যুগের সমালোচনা ছিলো সহজ সরল রুচিবোধের উপর। এ সময় কবিতার মান, ভাষা বা অলংকার এসব বিষয় খেয়াল না করে সমালোচক শুধু কবিতার আবেগ ও কল্পনাকে বিবেচনা করে সমালোচনা করতেন।

এরিষ্টটলকে বলা হয় সমালোচনাশাস্ত্রের জনক। কারণ, তিনিই প্রথম সমালোচক, যিনি কাব্যবিচারকে কাব্যপাঠের মতোই প্রয়োজনীয় মনে করেন। তিনি কবিতাকে নীতিশাস্ত্র থেকে মুক্ত করেন।

পরবর্তীতে আধুনিক যুগে এসে আরবী সহিত্য আরো অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। কবি, সাহিত্যিকরা এক দেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরের ফলে সাহিত্যের পরিধি বাড়ে।

১২.মো: আবু বকর সিদ্দীক, *আরবী সাহিত্যে সমালোচনা*(ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী ,ডিসেম্বর ১৯৮৯) পৃ. ৪২-৪৩

১৩. আহমদ আল সাইব, *উসুলুস নাক্‌দ আল-আদাবী*, পৃ. ১০৯-১০ উদ্ধৃত্ত. মো: আবু বকর সিদ্দীক ,আরবী সাহিত্যে সমালোচনা ,প্রাগুক্ত

বিভিন্ন সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারের সাথে বিভিন্ন সাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটে। তেমনিভাবে আরবি সাহিত্যের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়।

পরবর্তীতে অন্যান্য সাহিত্যে-সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগের ফলে সমালোচনার ক্ষেত্র ও আরো প্রসারিত হয়। নবম মতাব্দির শেষের দিকে ইবনে আল-মুতাজ সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে অনেক কাজ করেন। তিনি কবি ও সমালোচক দুইদিক থেকেই বিখ্যাত ছিলেন। তবে তিনিও অনেকটা তার পূর্বসুরিদের অনুসরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'তাবকাত আশ শুআরা' তে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেই কবিতা রচনা করছিলেন। এরপর ইবনে কুতায়বা নতুন কবিতা ও পুরনো কবিতা গুলো সংকলন করে কবিতার মূল্যায়ন করেন। এবং তিনি বলেন যে ,নতুন কবিতাই পুরনো কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইবনে মুতাজ তাঁর সমসাময়িক কবিদের কবিতা বিশ্লেষণ করে কবিতার মূল্যায়ন করতেন। যা ছিল একধরণের সাহিত্য সমালোচনা। তিনি তার কিতাব 'আলবাদি' (দ্যা বুক অফ ট্রপস) এর জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। যেখানে তিনি পাঁচটি প্রধান কাব্যগ্রন্থ কবিতার রূপক ও উপমাসহ সংকলন করেছিলেন। যদিও তার লক্ষ্য ছিলো এর মাধ্যমে কবিদের কাব্যতত্ত্ব তুলে ধরা।

কবিতার সমালোচকদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন কুদামাহ ইবনে জাফর। তার রচিত "নাকদ আর শির" (কবিতার মূল্যায়ন) ছিলো বিখ্যাত রচনা। যার মধ্যমে তিনি কাব্যিক সমালোচনা তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে তিনি কবিতার ছন্দ, উপমা সবসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণের পর কবিতার যে মাপকাঠি তুলে ধরেছেন সেটাই ছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবী কাব্যের যথার্থ মাপকাঠি।

আবদ আল-কাহির আল জুরজানি এগারো শতাব্দিতে ছিলেন একজন বিশ্ব বিখ্যাত সমালোচক। তাঁর " دلائل الإعجاز " এবং "আসরার আল-বালাগাহ" (বাকপটুতার রহস্য) হলো আরবি সাহিত্য সমালোচনার চিন্তাধারার প্রধান নিদর্শন।

আরবি সাহিত্য সমালোচনার এই ধারা ছাড়াও প্রাক-আধুনিক যুগেও সাহিত্য সমালোচনার নানা নতুন দিকের বিস্তৃতি ঘটেছিল। দশম শতাব্দীতে আবু হিলাল আল আসকারির "আস সিনাতাইন" এবং "আর-কিতাবাহ ওয়া আল শির" (The Book of the two skills, scribal Arts and

Poetry), এই বই দুটি কবিতার সমালোচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বই। আল-আসকারি এই বই দুটিতে কবিতার শৈল্পিক বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি সমসাময়িক কবিদের সাথে তার লেখার তুলনামূলক আলোচনা করেন এই বইতে। এবং সেখানে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের কবিতার বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করেন। মূলত এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য ছিলো কবিতার সমালোচনা, বৈশিষ্ট্যও বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তুলে ধরা।

আরেকজন বিখ্যাত সমালোচক হলেন ইবন রাশিক। তার এই সংক্রান্ত বিখ্যাত বই হলো "العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه" (The Mainsty concerning Poetry’s Embellishments, Correct Usages and criticism). এখানে তিনি কবিতার বিভিন্ন সমালোচনা করেন। সমসাময়িক কবিদের কবিতায় বৈশিষ্ঠ্যের সমালোচনা করেন। তার এই বইটি সমালোচনার ক্ষেত্রে বহু শতাব্দী ধরে সমালোচনার প্রাথমিক রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৪]

আরবি সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনায় ইসলামের প্রভাবও ছিল ব্যাপক। আরব সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা যদিও ইসলামী যুগের পূর্বেও ছিলো কিন্তু নবীর যুগে তা আরো প্রসার লাভ করে। সেসময় আল আসমাই (মৃত্যু ৮৩০), ইবনে জিনল (মৃত্যু ১০০১), আল-সুলি (মৃত্যু ৯৪৬), আল-কাদি আল জুরজানল (মৃত্যু ১০০১) এর মতো বিখ্যাত সমালোচকরা ছিলেন। যারা কবিতার সমালোচক ছিলেন। নবম শতাব্দীতে সমালোচনা একটি বৈধ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে সমালোচনা তার নিজস্ব নামে সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫]

আরবি প্রাক ইসলামিক ও প্রাথমিক ইসলামী যুগে নবম শতাব্দীতে কবিতা সংগ্রহ শুরু হয়। মূলত সেসময় থেকেই কবিতা সমালোচনা সুশৃংখল নিয়মে হয়ে থাকে।

১৪.https://www.britannica.com/art/Arabic-literature/Literary-criticism

15. https://literariness.org/2020/12/17/arabic-literary-theory-and-criticism/

সেই সময় থেকেই কাব্য সমালোচনা শুরু হয় ভাষার বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়েও ব্যাকরনগত বিষয়ে। অষ্টম শাতাব্দীরশেষের দিকে ইসলামী সাম্রাজ্য আরো ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। সেসময় আধুনিক নগারায়ন, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রসারের সাথে সাথে সাহিত্য সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটে।অনেক দেশেই তখন আরবী ভাষার ও প্রসার ঘটে।

এই সময়ে সাহিত্য সমালোচনা এমন একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে রূপ লাভ করে যা ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও আরো অনেক কিছু থেকে স্বতন্ত্র। আল খলিল ইবনে আহমাদ (৭১৮-৭৮৬) এসব বিষয় নিয়ে অনেক কাজ করেন। এ সময় পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা তাঁবু, উট, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে রচিত হতো এবং সমালোচনাও সেভাবে করা হতো। পরবর্তীতে কবিতায় লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক করে কবিতার আরো কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়। যেমন হিজা, গজল, অহংকার ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি এই ধারাতেই কবিতা রচিত হতো। যদিও কিছু সমালোচক সমালোচনা করে নতুন কিছু ধারা যোগ করেছিলেন তবুও তা খুব অল্পই ছিলো। আরবী সাহিত্য সমালোচনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ইসলামের আর্বিভাবের সাথে সাথে সাহিত্যের ধারাও পরিবর্তন হয়। পবিত্র কুরআন তখনকার সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সাহিত্য সমালোচনারও ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পায়। সেসময় ভালো লোকদের চরিত্র ও আখলাক নিয়ে কবিতা রচিত হত। খলিফা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ ও প্রসংশা করে অনেক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রাক ইসলামী কবি নাবিগা সম্পর্কে বলেন' "জাহেলী কবিদের মধ্যে তিনি (নাবিখা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করতেন না। তিনি সর্বদা সকল লোকের গুণ ছাড়া তাকে প্রশংসা করতেন না।[১৬]"

খলিফা উমর (রা) যুহায়র বিন আবি সুলমা সম্পর্কে বলেন সে কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতো না, সে অপরিচিত ও অদ্ভূত বর্ণনা দিতনা অথবা কোনো লোকের মধ্যে যে গুন নেই তার প্রশংসা করতো না।[১৭]

---

[১৬]. বাদী আল যামান, ২য় মাকামাত, উদ্ধৃত.নমো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্যে সমালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৭]. ইবন কুতাইবা, *আল-সি'রওয়া আল-সু'আরা* (কায়রো: ১৯৩২) পৃ. ৪৪ .উদ্ধৃত: মো: আবু বকর সিদ্দীক ,আরবী সাহিত্যে সমালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

নাবিগা ও জুহাইর সম্পর্কে হযরত উমর (রা) সাহিত্য বিচারের মাধ্যমেই গঠনমূলক ইতিবাচক সমালোচনা করেছেন। অতএব ইসলামের প্রামথিক যুগে রাজনৈতিক আন্দোলন ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে কবিতার ও উন্নতি হয়।

এরপর উমাইয়া যুগে সমালোচনা সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। এ যুগে গদ্য ও পদ্য সাহিত্য অনেক উন্নতি লাভ করে। উমাইয়া শাসকগণ সাহিত্যের জন্য অনেক উৎসাহ দিত। এ সময় কবি সাহিত্যিকরা রাজনীতি, যুদ্ধ, বিচারালয়, শাসকদের প্রশংসা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করতো। উমাইয়া যুগেই বিতর্কমূলক কবিতা বা নাকাইদের সূচনা হয়। এসময় বিখ্যাত কবি ছিলেন ফারায়দাক (মৃ. ১১০/৭২৮), জারীর (মৃ. ১১০/৭২৮), আখতাল (মৃ. ৯৫/৭১৩) প্রমুখ এ সময় সমালোচনা সাহিত্য এক কবিকে অন্য কবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও প্রসর ঘটে। এরপর কবিতায় সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত সমালোচনার ও শুরু হয়। এরূপ সমালোচনা ছিলো এসময় নতুন।

আব্বাসী যুগে কবিরা প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগের কবিতা সংকলন করেন। এবং সাথে সাথে পূর্বের সমালোচকদের সমালোচনাও সংগ্রহ করেন। এসময়ে কবিদের মধ্যে আবু আমর বিন ‘আলা ইউনুস বিন হাবীব, আল-আসমাই, ইবন সাল্লাম আর জুমাহী উল্লেখযোগ্য। এ সময় সমালোচকরা বলেন যে, সমালোচনা শুধু কবিতায় রুচিবোধের উপরই হবে না, বরং সমালোচনার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং সমালোচনা শিল্পের চর্চা।

দশম শতাব্দীতে প্রখ্যাত সমালোচক ছিলেন আল আমিদী আল জুরজানী, আবুল ফারজ আল ইসফাহানী, আল বাকিল্লানী, মুতানাব্বী প্রমূখ ব্যক্তিগণ। এরপূর্বে সমালোচনা ছিলো কবিতা ও কবির দোষ বর্ণনা করার সাথে সাথে নিজের কবিতার গুণাগুন বর্ণনা করা। কিন্তু মুতানাব্বী এসব পরিহার করে সততা, নিরপেক্ষভাবে কবিতার সমালোচনা করেন।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরবী সাহিত্য সমালোচনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংযুক্ত হয়। পুরনো সাহিত্যেরীতির বিরুদ্ধে নতুন সাহিত্যরীতির আন্দোলন গড়ে উঠে। কবি আবু নুআস এ আন্দোলনের নেতৃত্ব যদেন। আবু নুআসের সাথে আরো ছিলেন বাশ্‌শার বিন বুরদ্, আবু

আল-আতাহিয়্যা, মুসলিম বিন অলীদ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। তারা আধুনিক কবিতার বীজ বপন করেছিলেন। তাঁরা পুরনো কবিতা ও নতুন কবিতার ধারার মধ্যে তুলনা করেন।

১২শতাব্দী থেকে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরবী সাহিত্য সমালোচনা তেমন কোনো উন্নতি লাভ করতে পারেননি। মাত্র গুটিকয়েক সাহিত্যিক এসময় সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে কাজ করেন। ১৪শ শতাব্দীতে তিউনিসীয় ইবনে খালদুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি যেমন সুলেখক ছিলেন তেমনি তিনি সমালোচক হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার মতে শব্দই পদ্য ও গদ্যকে ক্রিয়াশীল করে, ভাব নয়। শব্দ মুখ্য, ভাব হলো গৌণ।[১৮]

আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্য সমালোচনা :

উনিশ শতাব্দীতে মুসলমান ও আরবদের মাঝে জাগরণ শুরু হয়। সেসময় সাহিত্যসমালোচনায় ও শুরু হয় নতুন ধারা। সেসময় কবিতা ছন্দশাস্ত্রের কঠিন নিয়ম থেকে বের হয়ে আসে। সাহিত্য সমালোচনা নতুন নতুন ধারা ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় আক্কাদ, আল-মাযিনী ও শুকরী সনাতন কবিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাদের মতে একটি ভালো কবিতার বৈশিষ্ট হলো কবিতায় থাকবে আন্তরিকতা, মৌলিক ঐক্য, কৃত্রিমতা পরিহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য। কবিতার সাথে সাথে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সাহিত্য সমালোচনার বিষয়টি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ফলে আরবী সাহিত্য সমালোচকদের সংখ্যাও এসময় বৃদ্ধি পায়। যারা আরবী সাহিত্য সমালোচনার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১৯]

আধুনিক আরবী সাহিত্যও অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় আধুনিকতার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পর্যায়ক্রমে অনেক আধুনিক হয়। আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্য ফরাসী ও ইংরেজী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিদেশী সাহিত্য যেমন আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে সংযুক্ত করেছে তেমনি পুরনো বিভিন্ন ধারাকে করেছে আরো আধুনিক। আধুনিক আরবী সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ,

---

১৮. মো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্যে সমালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৯. M.H. Bakalla, Arabic Culture, Ko 263-64, Ai Ashmawi, M.2, “Arab Contribution to literary Criticism” ১৪ খণ্ড, পৃ. ৫১-৬৮, উদ্ধৃত: মো: আবু বকর সিদ্দীক আরবী সাহিত্যে সমালোচনা. পৃ. ৫২-৫৩

মুক্তছন্দের সূচনা হয়। কল্পনা প্রবণতা, অমিত্রাক্ষর ও মুক্তছন্দ এই তিনটি বিষয় আরবী সাহিত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে। এর একটি আন্দোলন হয় আমেরিকাতে। আর অন্য দুটি হয় মিশরে। এই আন্দোলনগুলো আরবী সাহিত্যকে আধুনিক আরবী সাহিত্যে রূপান্তরিত করে। প্রথম আন্দোলনে ছিলো ইবরাহিম আব্দুল কাদির আল-মাযিনি (মৃ. ১৩৬৯/১৯৪৯), আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ (মৃ. ১৩৮৪/১৯৬৪), ইব্রাহীম, আব্দুর রহমান শুকরীদ (মৃ. ১৩১৮/১৯৫৮) এরা দিওয়ান গ্রুপ গঠন করেন, গীতিকাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আহমদ যাকী আবু শাদী (মৃ. ১৩৭৫/১৯৫৫) যিনি রোমান্টিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইংরেজী সাহিত্যিক শেলী, কীটস, ডিকেন্স, জর্জ বার্নার্ড শ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের আরেকটি ধারা হলো মাহজারী (দেশান্তরী সাহিত্য)। সেসময় বিদ্রোহের কারণে অনেক আরবী লেখকগণ সিরিয়া ও লেবানন থেকে আমেরিকায় যান তখন এ সকল মাহজারি লেখকগণ প্রবাসে বিভিন্ন লেখক সংঘ গড়ে তোলেন। তবে তারা পাশ্চাত্য লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। আর এভাবেই আরবী সাহিত্যে পাশ্চাত্য ধারা প্রবেশ করে। বিশেষ করে এডগার এলান, পো, ওয়াল্ট হুইটম্যান ও লংফেলোর প্রভাবই বেশী ছিলো। এ সকল মাহজারী লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জিবরান খলীল জিবরান, মিখাইল নু'আইমা, ইলিয়া আবু মাদী প্রমুখ।[২০]

এভাবেই আরবী কবিতার মধ্যে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া প্রবেশ করে। সমালোচনার ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। মাহজারী সাহিত্যিকগণ দেখলেন যে, পাশ্চাত্য কবিতা অনেক আধুনিক। তখন তারাও আরবী কবিতা নিয়ে কাজ শুরু করেন। আরবী কবিতাকে নতুন করে পুরনো শৃংখল ভেঙ্গে নতুনভাবে সাজান। এসময় কিছু ফ্রান্স ও ল্যাটিন কবিতা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু সে কবিতার কোনো অলংকারশাস্ত্র বা সৌন্দর্য হানিকর কোনো পরিবর্তন হয়নি।[২১]

---

২০. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্যে সমালোচনা,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

21.M.H. Bakalla, Arabic Culture, Ko 263-64, Ai Ashmawi, M.2, “Arab Contribution to literary Criticism” ১৪ খণ্ড, পৃ. ২৬২-২৬৬, উদ্ধৃতঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক আরবী সাহিত্যে সমালোচনা. পৃ. ৫৫

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিছু সাহিত্যিক কারাবরণ করেন। এসময় এ সকল সহিত্যিকগণ নতুন উদ্যোমে নতুনভাবে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার শুরু করেন। মূলত মিশর থেকে আধুনিক সমালোচনার শুরু হলেও এসময় তা আরো প্রসার লাভ করে। এসময় যারা সাহিত্য সমালোচনা করেন তাদের মধ্যে আল মাযিনী, আল আক্কাদ, হায়কাল প্রমুখ। একজন আধুনিক সাহিত্য সমালোচক কেবলমাত্র সুন্দর রচনা শৈলীর উপরই গুরুত্বারোপ করেন না। সাথে সাথে লেখকের চিন্তার গভীরতা, সূক্ষ্ম অনভূতিও লক্ষ্য করেন। সেসময় লেবাননের লেখক সুলাইমান আল বিস্তানী হোমারের ইলিয়ড গ্রীক ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। এই বইটি আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচনাকে অনেক দূর এগিযে নিয়ে যায়। সুলাইমান আল বিস্তানী আরবী সাহিত্য সমালোচনাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। এক তাত্ত্বিক সমালোচনা দুই ব্যবহারিক সমালোচনা।[২২]

আধুনিক আরবী সহিত্যের প্রথম সমালোচক হলেন ইব্রাহীম আল ইয়াযিজী (মৃ. ১৯০৬)। তিনি রাজনৈতিক পরিবেশ, আরবী ভাষার ত্রুটি ও জড়তা থেকে সাহিত্যকে সংশোধন করেন। আধুনিক যুগে সাহিত্য সমালোচনাকে শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে যান।

বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকাসহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্য ও সমালোচনার ব্যাপারে অনেক গবেষণা হচ্ছে। আর সমালোচনা সাহিত্যও দিন দিন আধুনিক হচ্ছে। আধুনিক আরবী সাহিত্যেই গীতি কবিতার সূচনা, আমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মুক্ত ছন্দের বহুল ব্যবহার শুরু হয়।

---

[২২] প্রাগুক্ত পৃ. ২৬২-২৬৬

সমকালীন আরবী সহিত্যিকদের বিভিন্ন সমালোচনা :

মিখাইল নু'আইমা'র সময়ে আরো অন্যান্য সাহিত্য সমালোচকরা আরবী সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছেন। এদের মধ্যে ত্বহা হুসাইন, আর-আক্কাদ, আল-মাযিনী, মাহমুদ আল বারুদী, শাওকী দায়েফ ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য।

এসময় আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ ও আল মাযিনী কবিতার এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। হায়কাল (মৃ. ১৯৫) উপন্যাস রচনায় নতুন এক কলাকৌশল আবিষ্কার করেন। আক্কাদ ও মাযিনীর আধুনিকীকরণের ফলে শাওকী ও হাফিযের গীতিকবিতায় এক নতুন রূপের সৃষ্টি হয়। আক্কাদ ও মাযিনী শাওকীর লেখার সমালোচনা করে বই লিখেন। তারা মানফালুতী ও তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, তাঁর রচনাগুলো অর্থ ও ভাবশূন্য শব্দগুচ্ছের সমাহার মাত্র। তাঁর রচনাশৈলী অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল এবং শুধু আবেগের প্রাচুর্যেই প্রভাব বিস্তারকারী।[২৩]

ত্বহা হোসাইন কাজ করেছেন ব্যবহারিক সমালোচনার উপর। তাত্ত্বিক সমালোচনা নিয়ে তিনি কোনো বই লিখেননি। ব্যবহারিক সমালোচনার উপর হাদিস আল আরাবি'আহ, মা'আল মুতানাব্বী, যিকরা আবিল 'আলা-আদাবুর- জাহিলী, ফুসুল ফিল আদব ওয়া আল-শির ওয়া আল-নছর ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছিলো সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা। তাঁর 'ফিতনা আল কুবরায়' দ্বিতীয় খন্ডে শেক্সপিয়ারের লেখার প্রভাব পাওয়া যায় এবং এখানে তিনি প্রথম পাঁচ শতাব্দীতে প্রাচ্যে আরবী সহিত্যে ইসলামের প্রভাব উল্লেখ করেন। ডক্টর সি সি এডামস বলেন, ত্বহা হুসাইন আরবী সাহিত্যপাঠে পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচনার নিয়মকানুন নির্ভীকভাবে প্রয়োগ করেছেন। সমালোচনার প্রাচীন পদ্ধতিতে ইতঃপূর্বে যে সকল বাধা বিপত্তি পাশ্চাত্যের অঙ্গীকারকে ব্যহত করেছে, তিনি তা মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং মিসরীয় পাণ্ডিত্যকে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের তুলনায় বৈজ্ঞানিক দক্ষতানুসারে বৃদ্ধি করেছেন।[২৪]

---

২৩. মো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্যে সমালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২৪. P. Cachia, Taha Hussayn. উদ্ধৃত, মো: আবু বকর সিদ্দীক , আরবী সাহিত্যে সমালোচনা, পৃ. ১৩৫

ত্বহা হুসাইন পূর্বের সকল রীতি পরিহার করে নতুন ধারায় সমালোচনা করেন। সাহিত্যের অধ্যয়নকে দার্শনিক, ধর্মীয় জাতিগত পক্ষপাত থেকে মুক্ত করেন। তিনি এসময় আরো দাবি করেন, ধর্মীয় দিক থেকে বিবেচনা না করে সাহিত্যকে শুধু সাহিত্য হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। তিনি সাহিত্যকে এমনভাবে পর্যালোচনা করেন যে, যেন সাহিত্য ও সমালোচনা দুটি কাছাকাছি বিষয়। তিনি সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেন এক: সৃজনশীল সাহিত্য। যার অধীনে থাকবে বিশুদ্ধ শিল্প ও সাহিত্য। দুই: বর্ণনামূলক সাহিত্য যেমন সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যের বিজ্ঞান ইত্যাদি।[২৫] বর্ণনামূলক সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে সাহিত্য সমালোচনা। ত্বহা হুসাইন একে নাকদ (সমালোচনা) শব্দ উল্লেখ করেছে। এর সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

শুধু রুচির উপরই নির্ভর করবে। তার মতে সমালোচনা হবে নিখুঁত আয়নার মত। যাতে করে পাঠক ও প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব রুচির উপর সাহিত্যকে বিচার করতে পারে। এককজনের রুচিবোধ একেকরকম হতেই পারে। সাহিত্যকে সেভাবে বিচার করা যেতেই পারে। যেমন ত্বহা হুসাইন শিরে আজহারীদের রুচিবোধের সাথে অন্যান্যদের রুচিবোধের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। আবার যখন তিনি মোস্তফা কামিল প্রশংসায় শাওকীর গীতি কবিতা শুনেন তখন তিনি সাধারণ লোকদের রুচির পক্ষেই মত দেন। কিন্তু পরে জনৈক বন্ধুর সাথে পুনর্বিচার করে তিনি বুঝতে পারেন যে, আসলে এটা ছিলো তাম্মামের গীতিকবিতার একটি হাস্যকর অনুকরণ।[২৬] ত্বহা হুসাইনের মতে সমালোচনা হবে বিজ্ঞান সম্মতভাবে। বিজ্ঞান ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করে সমালোচনা হলে সেটা হবে মূলপাঠ সংক্রান্ত সমালোচনা। মূলপাঠ সংক্রান্ত সমালোচনা হলো মূলত ব্যক্তিগত মতামত।

সমালোচককে সমালোচনা করতে হবে সহিত্যকর্মের, সাহিত্য স্রষ্টার নয়। ত্বহা হুসাইন ও সেভাবে কাব্যের সমালোচনা করতেন। যদি কোনো কবির সমালোচনা করতেন, তা করতেন মূলত কবিতাকে ভালোভাবে বুঝার জন্য। এধরণের সমালোচনার মনোবিজ্ঞান হলো গৌণ বিষয়। প্রধান

---

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

উদ্দেশ্য হল সাহিত্য শিল্পের বিশ্লেষণ, ত্বহা হুসাইন আরবী সাহিত্যে আব্বাসীকে দুটি বড় রেনেসাঁ যুগের প্রথম হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশেষ করে গ্রীকদের অবদান অনেক বড় করে দেখেন। গ্রীকদের অনেক বই আরবরা আরবীতে অনুবাদ করেছেন। যার ফলে গ্রীকদের অলংকাশাস্ত্রে ও শৈল্পিক সৌন্দর্য আরবীতে প্রবেশ করে এর মাধ্যমে সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয়। সংস্কৃতির, চিন্তা-চেতনার আদান প্রদান হয়।

আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে ত্বহা হুসাইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাহিত্য সমালোচনা কওে না। তার মতে ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ সাহিত্যের প্রধান বিষয় নয়। কেউ রাষ্ট্রপ্রধানের প্রশংসার কবিতা রচনা করলে সেটাকে কেবল অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেখান থেকে ভালোটা গ্রহণ করে পর্যালোচনা করা যায়। ভুলকে পরিহার করতে হবে। তিনি যখন কোনো কবিতার সমালোচনা করতেন তখন তিনি তার বিস্তারিত জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কোন প্রেক্ষাপটে কবিতা রচিত হয়েছে, কেন হয়েছিলো এসকল বিষয় বিবেচনা করে সমালোচনা করতেন। আরবী সমালোচনার ক্ষেত্রে সাআলিবী সর্বপ্রথম পরিবেশগত পদ্ধতি ও ত্বহা হুসাইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমালোচনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি সমালোচনাকে নতুন ভাবধারা ও চিন্তাধারার সাথে সংযুক্ত করেন।[২৬]

আধুনিক আরবী সাহিত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন, মাহমুদ সামী আল বারুদী (মৃ. ১৯০৪)। পরে শাওকী ও হাফেজ ইব্রাহীম তাঁকে অনুসরণ করেন, আর বারুদীর কারণেই আরবী কবিতা তার হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পায়। কবিতার অলংকারশাস্ত্রে কৃত্রিম সৌন্দর্য কমতে থাকে।

বারুদীর কারণেই তৎকালীন সময়ে খুব সামান্য বিষয় বা ব্যক্তিগত কারণে কবিতা রচনা না করে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা শুরু করেন। শাওকী তার পূর্বপুরুষদের কবিতা অনুসরণ করতেন। এজন্য তার সাহিত্যগোষ্ঠী ও সাহিত্যের পুরনো ধারা

---

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

নিয়ে হয়েছিল। কিন্তু আক্কাদ মাযিনী, আশ-শুকরীর সাহিত্যগোষ্ঠী ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে আরবী কবিতায় নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। যা ছিলো বারুদীর সমর্থক থেকে আলাদা। এসকল সমর্থকরা সব পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে বলেন, সে কবিই আসল কবি যার কবিতায় সত্য, নৈতিক বিষয় , আদর্শ, মুক্ত চিন্তাধারা ও মৌলিক বিষয় বিদ্যমান। অন্যদিকে রূপরীতি যদি প্রকৃতির উপাদান বাধা প্রাপ্ত হয় তবে তা অনুকরণীয় নয়।[২৭]

ব্যবহারিক ও বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার ক্ষেত্রে আরেক বিখ্যাত সমালোচক হলেন শাওকী দায়েফ (জন্ম ১৯১০)। তিনি প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের সকল সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন করে তুলনামূলক সাহিত্য রচনা করেন। তিনি আরবী সাহিত্যের শুরু থেকে অর্থাৎ প্রাক ইসলামী, ইসলামী, উমাইয়া, আব্বাসী আধুনিক যুগ সহ সকল লেখকদের লেখা আলোচনা সমালোচনা করে প্রায় ৩৫ টিরও বেশী বই রচনা করেন। এই সকল বইগুলোতে তিনি আরবী সাহিত্য সমালোচনার কালকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রথম যুগটি এ্যারিষ্টটলের যুগ থেকে আঠারো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় যুগটি আঠারো শাতব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ্যরিস্টটলের সমালোচনা ছাড়া সেসময় অন্যকারো সমালোচনা তেমন মানসম্মত ছিলো না। দ্বিতীয়যুগের সমালোচকগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাহিত্য সমালোচনা করেন। ফলে আধুনিক যুগে এসে সমালোচকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সমালোচকগণও বিভিন্ন ধারায় সামলোচনা করেণ।[২৮] বর্তমান যুগে একদল সমালোচকের মতে সাহিত্য সমালোচনা একটি শিল্প, বিজ্ঞান নয়।

অন্যান্য সাহিত্যেও মতো আরবী সাহিত্যেরও রয়েছে সমালোচনার সুদীর্ঘ ইতিহাস। আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্যেও সমালোচকগণ সমালোচনার মাধ্যমে আরবী ভাষাকে করেছে আরো সমৃদ্ধ ও আধুনিক। এই যুগে এসে সমালোচনার মধ্যমে অনেক বিষয়ের সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। ফলে অরবী ভাষা হয়েছে অনেক সমৃদ্ধ ও উন্নত।

---

27. Khalafallah Muhammad, “Some Landmarks of Arab achievements in the field of Literary criticism”, Bulletin Of the Faculty of Arts, Alexandria University Press (Egypt 1961) ১৫ খণ্ড পৃ. ৩-১৯

২৮. মো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্যে সমালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরবী সাহিত্যে সমালোচনায় মিখাইল নু'আইমা'র অবদান

মিখাইল নু'আইমা'র আরবী সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আরবী গদ্য সাহিত্যে তিনি ছিলেন এক স্পষ্ট ধারার প্রবর্তক, সাহিত্য সমালোচনাকে গতানুগতিক ধারার স্থান থেকে তিনি এক নতুন ধারায় নিয়ে আসেন। তার সাহিত্য ছিলো প্রানবন্ত এক নতুন সাহিত্য। যাতে গতানুগতিক ও অনুকরণের কোন ছোঁয়া ছিলোনা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধারা থেকে তিনি কেবলমাত্র আধুনিক সহিত্য সংস্কৃতির দিকগুলো ও নতুন সভ্যতায় অবদানগুলো একত্রিত করেছেন। এগুলো তার অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণভাবে নতুনত্বের সাথে চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।[১]

আধুনিক যুগের প্রখ্যাত কবি সমালোচক, প্রাবন্ধিক মিখাইল নু'আইমা আরবী সাহিত্য সমালোচনাকে বিশ্ব দারবারে নতুনরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে সমালোচনার মাধ্যমে সমালোচনা সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি নতুন ধারায় সাহিত্য সমালোচনা শুরু করেন। তিনি ছিলেন আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তি যিনি সমালোচনার পুরনো ধারা ভেঙ্গে নতুন ধারায় সাহিত্য সমালোচনার সূচনা করেন।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যময় দিক হলো সাহিত্য সমালোচনা। সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত আরবী সাহিত্য সমালোচনা ছিলো সীমিত। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যিকগন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাহিত্য সমালোচনার রীতি অনুসরণ করেছেন। তাদের সমালোচনার ধারাও যেমন আধুনিক তেমনি বিষয়বস্তু ও বৈচিত্রময়। তেমনি এক সমালোচনা মূলক গ্রন্থ হলো মিখাইল নু'আইমা'র الغربال(The Sieve) (চালুনি) নামক গ্রন্থ। যা প্রকাশে আরবী সাহিত্যের Manifesto হিসেবে পরিচিত।[২]

---

১. হান্না আল ফাখুরী , *আল জামে ফি তারিখ আল আদাব আল আরবী আল আদাব আল হাদীস* , প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৭

2..Ismat Mahdi, Arabic literatune -1900M 1967, p-153, উদ্ধৃত ,নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ,পৃ. ২৮১

মিখাইল নু'আইমা সেই সময়ে ছন্দযুক্ত কবিতার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন: কবিতার জন্য ছন্দ (وزن) কিংবা অন্তমিলের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা আন্তমিল সম্পন্ন একশ চরণের কাসীদার চাইতে সুবিন্যস্ত ও সংগীত লহরী বিশিষ্ট কিছু গদ্য কবিতার গুনাগুন অনেক হারে বেশী থাকে। তার একথায় বর্ণনা দিতে গিয়ে Ismat Mahdi বলেন,[৩]

An open revolt against the qasida, al Ghirbal attacks the conventions of eloquence and purity of style, which the ancient Poets as well as the first generation of al-Nahda and considered prerequisites to any poetic composition. Nuaima insists that poetry should be meaningful and relate to man's spiritual and emotional needs and satisfy his longing for beauty and music.

কবির বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে যেয়ে মিখাইল নু'আইমা বলেন,[৪]

والآن لنقف ونسأل من هو شاعر؟
الشاعر نبى وفيلسوف ومصور وموسيقى وكاهن.
نبى- لأنه يرى يعينه الروحية ما لا يراه كل بشر ومصور – لأنه يقدر أن يسكب ما يراه
ويسمعه فى قوالب جميلة من صور الكلام وموسيقى - لأنه يسمع أصواتا متوازية حيث
لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعة-

Now we may ask ourselves, what is a poet? A poet is a prophet a philosopher, a painter, a musician, and a priest in one. He is a prophet because he can see with his spiritual eye what can not be seen by all other mortals. A painter is because he is capable of molding what he can see and hear in beautiful forms of verbal imagery. A musician can hear harmony where people can find only discordant noise .[5]

---

[৩] প্রাগুক্ত. পৃ. ১৫৪

[৪] মিখাইল নু'আইমা, "*আল গিরবাল*", *আল মাজমুআতি আল কালিমাহ্*, (বৈরুত: :দারুল ইলম লিলমালাঈন) ১৯৭৪ খৃ., তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৪০১-৪০২

[৫] As quoted by M.M Badawi A critical Introduction to Modern Arabic poetry p-186

মিখাইল নু'আইমা গল্প, জীবনী সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা যাই লিখেছেন তাতে শৈল্পিক ভিন্নতা থাকলেও তার সমালোচনায় দৃষ্টিভঙ্গির ছিলো পরিস্কার। মিখাইল নু'আইমা ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আরবী ভাষায় প্রকাশিত "আল ফুনুন" (الفنون) নামক পত্রিকাটি প্রথম হাতে পান। পরবর্তীতে এর আংগিক ও বর্ণনাধারার কারণে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ পত্রিকায় জীবরানের লিখিত (الأجنحة المتكسرة) 'ভাঙ্গাবাহু' নামক উপন্যাসের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়।

মিখাইল নু'আইমা জবরানের এ প্রবন্ধের সমালোচনা করে উক্ত প্রবন্ধে "فجر الأمل بعد ليل اليأس"(নিরাশার পরে আশার আলো) নামে একটি সমালোচনামূলক লেখা প্রেরণ করেন। এটিই তার সমালোচনামূলক প্রথম প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যকে ''Mummified literature : The literature of imitation and decoration'' বলে সমালোচনা করেন।[৬]

১৯১৬ সালে "আল ফুনুন" পত্রিকায় "العاقر" (অনুর্বর) নামে একটি গল্প সহ বিভিন্ন গল্প প্রকাশ করেন। নাসিব আরদাহ عدد سوريا المنكوبة (দুর্দশাগ্রস্ত সিরিয়ার সমস্যা নামে এই পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। নু'আইমা সেখানে "مهرجان الموت " (মৃত্যুর উৎসব) নামে আরেকটি গল্প লিখেন। নাসীব আরদাহ সেসময় নু'আইমাকে বলেন, আপনার লেখা মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। মানুষ আপনার লেখার প্রশংসা করছে। সাহিত্যের উন্নতির লক্ষ্যে আপনার লেখা আরো এগিয়ে নিয়ে যান। হে সম্মানিত ভ্রাতা, আপনি সাহিত্যের জন্য আরো অধ্যাবসায়ী হোন। সাহিত্যের নবজাগরণকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।[৭]

"আল ফুনুন" পত্রিকায় তার এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশের পর চারদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তার ছাত্রজীবনের বন্ধু নাসীব আরীদাহ তাকে নিউইয়র্ক ফিরে এসে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য তাদের সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। তার লেখা "আল ফুনুন" পত্রিকাকে সিরিয়া, লেবানন, মিশর ও আমেরিকাতে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

---

৬. মীখাইল নু'আইমা, *সাবউন* , প্রাগুক্ত. পৃ. ৩১৪

৭. ড. নাদিরা জামিল আর সাররাজ, *শুআরা আল রাবিতা আল কলামিয়্যাহ* (কায়রো: দার আল মা'আরিফ)১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ৭৮

তাই তারা তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন,

Arida went so far as to write to him and say that his articles had made “Al funun” popular in Syria, Lebanon, Egypt, and the Southern Mahjar. [৮]

সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে মিখাইল নু‘আইমা নতুন এক জগৎ উম্মোচিত করেছিলেন। রাশিয়ায় অবস্থানকালে সময়ে তিনি আরবী সাহিত্যের অপ্রচলিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন। নু‘আইমা’র মতে সাহিত্য হলো সেটাই যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে বুঝতে পারে। সাহিত্যকে সমালোচনার মাধ্যমে তিনি তার চিন্তা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে আরব বিশ্বে এক নতুন ধারার সূচনা করেন।

মিশরে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর সময় মাহমুদ সাফওয়াত আল সাত (১৮২৫-১৮৮০)। আলী-আল লায়থি (মৃত্যু ১৮৯৬ খ্রি.), আবদুল্লাহ ফিক্‌রী (মৃত্যু ১৮৮৯ খ্রি.) ও অন্যান্য আরো কয়েকজনের সাহিত্য কর্ম ছিলো শব্দের সাথে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নায়। যারা সাহিত্যের যথাযথ বৈশিষ্ট্য ছাড়াই নিজেদের মনোরঞ্জনের বা কখনো কখনো ব্যক্তিস্বার্থে কারো মনোরঞ্জনের জন্য রচনা করতো। এবং এই অবস্থা শুধু মিশর বা লেবাননে নয় সারা আরব বিশ্বেই ছিলো।[৯] মিখাইল নু‘আইমা সেই সময়ে সমালোচনা করে সাহিত্যকে এক নতুন ধারায় নিয়ে আসেন। ১৯২৩ সালে মিখাইল নু‘আইমা তার প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন যার নাম ”গিরবাল” (الغربال) (The Sieve)। এই সংকলনে রাশিয়ান সাহিত্যের প্রভাব ও রাশিয়ান সাহিত্যের সমালোচনা ছিলো অনেক। এখানে তার সমালোচনায় পাশ্চাত্যের বিষয়গুলো এতটাই লক্ষণীয় ছিলো যে এ সম্পর্কে Professor kratchkovsky বলেছেন: It seemed to me that his works contained certain echoes of Russian critical thought which was little known to the Arabic Literature of the time.

---

৮. Salma Khadra Jayyusi, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry (LEIDEN.E. J Brill 1977) P.108

9. Hussain Muhammad Ali Dabbag, Mikhail Naimy: Some aspects of his thought as revealed in his writing,(Durham University: January 1968)pg-213

One of the items in this volume (al-Ghirbal) was the introduction to the Play Fathers and sons. Which was unknown to us, and the title of which evoked reminiscences of Russian Literature. [১০]

“আমার কাছে তার রচনাগুলো রাশিয়ান সমালোচনামূলক চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি মনে হয়েছে, যা তৎকালীন আরবী সাহিত্যে খুব কমই ছিলো। তার মধ্যে অন্যতম রচনা হলো Al-Ghirbal. যার মধ্যে ছিলো “Fathers and Sons” নাটকের ভুমিকা যা আমাদের কাছে অজানা ছিলো এবং যার শিরোনাম রাশিয়ান সাহিত্য পুনরজ্জীবন ঘটিয়েছিলো।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিখাইল নু‘আইমা এমন একটি সমাজে বসবাস করতে এসেছিলেন যা তার চিন্তা চেতনার সাথে মিল ছিলো না। তার ধ্যান ও ধর্মীয় অনুভূতির সাথেও মিল ছিলো না। তবুও তিনি আমেরিকানদের জীবনীশক্তি ও অগ্রগামী চিন্তা চেতনায় ব্যাপকভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর মাধ্যেমেই তিনি আরব জীবনকে আলোড়িত করতে চেয়েছেন। ‘*আল গিরবাল*’ রচনার মাধ্যমে তিনি আরবী সহিত্যিকদের চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় সাথে সাথে মানুষ হিসেবেও চিন্তার পরিবর্তন করার আহ্বান করেছেন। এভাবে তিনি সাহিত্য সমালোচনার সাথে সাথে মানব সমাজের সমালোচনা করে সমাজের পরিবর্তনের কথাও বলেছেন।

সমসাময়িক আরবী সাহিত্য নিয়ে মিখাইল নু‘আইমা’র সমালোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিলো সেই সময়ের লেখকদের মাঝে আন্তরিকতার অভাব। কারণ তাদের সাহিত্য ছিলো শব্দ নিয়ে খেলার নিরর্থক প্রচেষ্টা মাত্র। আন্তরিকতার যথেষ্ঠ অভাব ছিলো বলেই তিনি সে সাহিত্যের সমালোচনা করেন।

---

10. Among Arabic Manuscripts, by Professor kratchkovsky Pg-57

মিখাইল নু'আইমা'র নতুন ধারার সাহিত্য সমালোচনা

আরবী সাহিত্যে তৎকালীন সময়ে যে দুর্বলতা ও কয়েক শতাব্দী ধরে যে অবক্ষয় চলছিল নু'আইমা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সমালোচনার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেন। তিনি রাশিয়ায় পড়াশোনা করেন ও রাশিয়ান সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হন এবং আরবী সাহিত্যকেও সেভাবে আধুনিকীকরণের জন্য কাজ করেন। রশিয়ান ভাষার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আরবি সাহিত্যে বিদ্যমান দুর্বলতা তিনি বুঝতে পারেন। যেমন তিনি বলেছেন আমাদের সাহিত্যের দূর্বলতা আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। আরবী সাহিত্য রোগে ভুগছে তার চিকিৎসার জন্য একটি সমাধানের পথ খুঁজছি।[১১]

১৯১৩ সালে আমেরিকায় আসার পর নু'আইমা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাসিব আরিদার কাছ থেকে "আল ফুনুন" পত্রিকাটি হাতে পান। এবং পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বোর্ডের সাথে পরিচিত হন। যেমন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো জিবরান খলীল জিবরান, আর রিহানী প্রমুখ।[১২] এই পত্রিকাতেই তিনি প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। নু'আইমা বলেন" আমি জিবরানের "ব্রোকেন উইংস" বইটি পড়েছি এবং এটিকে রাশিয়ান সাহিত্যের সাথে তুলনা করেছি। আমি এটির অবস্থান আমাদের সাহিত্য থেকে অনেক দূরে পেয়েছি। আমি এই সাহিত্যের ভাবনা আমার হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছি। তাই আমি এটি সম্পর্কে আমার প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছি। এটি ছিল আমার সমালোচনামূলক সাহিত্য জীবনের শুরু।"[১৩]

পরবর্তীতে ১৯৩২ সালে তিনি "আল-গিরবাল" নামক গ্রন্থে তার মূল্যবান সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলো একত্রে প্রকাশ করেন। এবং আরো পরে ১৯৭৩ সালে ফী আল আল-গিরবাল আল-জাদীদ নামক গ্রন্থ তার অন্যান্য সমালোচনাগুলো প্রকাশ করেন। এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলোতে তিনি পাঁচটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ও সেগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।

---

১১. মিখাইল নু'আইমা, *আব'আদু মিন মস্কো ওয়ামিন ওয়াশিংটন*, (বৈরুত: দারুস সন্দিও, ১৯৬৬খৃ.) পৃ. ৬৭

১২. মিখাইল নু'আইমা, *জিবরান খলিল জিবরান* (বৈরুত : নওফাল ফাউন্ডেশন, সংস্করণ : ১৯৮৫) পৃ. ১৭৬

১৩. আল আকলাম ম্যাগাজিন, দশম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৭৫) পৃ. ৪৯

তিনি সেখানে সমালোচনা সম্পর্কে বলেছেন, সমালোচকের বৈশিষ্ট্য ও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেছেন ও সাহিত্যের মূল্যায়নের মান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি সমালোচকের ভাষা কেমন হবে সেব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি কবিতা ও গদ্যের সমালোচনা করেছেন। আমরা নিম্নে তার সমালোচনার বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

প্রথমত : সাহিত্য সমালোচনার ধরণ ও সমালোচক :

নু'আইমা'র মতে সাহিত্য সমালোচনা হলো সহিত্যের আবেগ, অনুভূতি ও ধারণার মূল্যায়ন। সাথে সাথে সাহিত্যের ভালো-মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য।[১৪] নু'আইমা বিশ্বাস করেন যে, সমালোচনা সাহিত্যে এখনও আরবদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করেনি। কারণ তারা সমালোচনা সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচকের মূল্য বুঝেনি। তাই একজন সমালোচককেও সমালোচনার হীনমন্যতার মনোভাব থেকে দূরে সরে সাহিত্য সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সমালোচনা করতে হবে। লেখক ও সমালোচকের পার্থক্য বুঝতে হবে।

একজন লেখকের জানা উচিত যে, তার দুটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে। একজন সাহিত্যিক বা লেখক তিনি লেখক হওয়ার আগে একজন মানুষ। একজন সমালোচক যদি তার লেখার সমালোচনা করেন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তার খ্যাতিকে কলঙ্কিত বা নষ্ট করতে চান। একজন প্রকৃত পাঠককেও সমালোচকের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে হবে । তাদেরও জানা উচিত, সমালোচকের কাজ শুধু সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের উপকারিতা বা অপকারিতাই প্রকাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত সমালোচকের কাজ একজন জহুরির কাজের মতো, যে কিনা বিভিন্ন ধাতুর টুকরো দেখেই একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করতে পারে। এবং সে ঐ নানা ধরণের ধাতু থেকে স্বর্ণকে বাছাই করতে পারে ও প্রয়োজনে একটার পরিবর্তে অন্যটিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। উত্তম সমালোচকের বৈশিষ্ট্য ও হবে ঠিক এমনি। একজন উত্তম সমালোচক কেবল একজন সমালোচনাকারীই হবে না, তাকে একজন স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শকও হতে হবে।[১৫]

---

১৪. মিখাইল নু'আইমা, আল-গিরবাল দশম সংস্করণ (বৈরুত: নাউফেল ফাউন্ডেশনঃ ১৯৭১) পৃ. ১৩,১৮

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩,১৮

সমালোচক একজন স্রষ্ঠা, কারণ তিনি সমালোচনার মাধ্যমে লেখকের লেখাকে নতুনভাবে অন্যদের কাছে প্রকাশ করেন। মূল লেখক যখন কোনো গদ্য বা পদ্য রচনা করেন তখন তার রচনার পর কী ঘটবে সেটা নিয়ে চিন্তা করেননা। তিনি তার মনের ইচ্ছা অনুযায়ী যা রচনা করার ইচ্ছা সেটা রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, শেক্সপিয়ার যখন তার উপন্যাস রচনা করেছিলেন তখন কী তিনি ভেবেছিলেন, এই রচনাগুলোকে সমালোচনার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হবে?[১৬]

রচনাগুলোই তাকে পরবর্তীতে শ্রদ্ধা ও অমরত্বের দিকে নিয়ে যাবে? একজন লেখক যেমন কোন রচনা সৃষ্টি করেন তেমনি সমালোচকও লেখকের রচনাটিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেন। কারণ তিনি যখন সাহিত্যের মান নির্ধারণ করেন তখন তিনি নিজেকে অন্যদের কাছে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের নতুন ধারণা তৈরি করেন।[১৭]

যদি সমালোচক বুঝতে পারেন যে, এই লেখাটির সমালোচনার দরকার নাই তিনি সেটা করেন না। আবার কোনো লেখার সমালোচনার প্রয়োজন মনে করলে সেই লেখার শৈল্পিক সৌন্দর্য বজায় রেখে, সাহিত্যের মান ঠিক রেখে, সততার সাথে সেই সাহিত্যের ব্যাপারে তার মতামত তুলে ধরেন।[১৮]

একজন প্রকৃত সমালোচক অনেক সময় পথ প্রদর্শকের কাজ করেণ। কারণ লেখকের লেখার ভালো-মন্দের যাচাই করেন তিনি। যেমন একজন লেখক হয়তো একটি গদ্য বা পদ্য রচনা করে ভাবেন অনেক ভালোগদ্য বা পদ্য রচনা করেছেন। কিন্তু সমালোচক তার গদ্যের বা পদ্যের সমালোচনা করে তার সাহিত্যের মূল্যায়ন করেন এবং তার গর্বের হ্রাস করেন। অনেক লেখক অনেক সমালোচনার জ্ঞানহীন সমালোচকের কারণে তার লেখার জন্য সঠিক মূল্যায়ন পান না। কিন্তু একজন বিচক্ষণ সমালোচক লেখকের মূল রচনার সমালোচনা করে লেখার মান আরো বাড়িয়ে দেন।

---

১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৮

১৭. মিখাইল নু'আইমা, *আন নাক্‌দা ওয়াল কালিমাহ*, আল আদাব ম্যাগাজিন, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, (জানুয়ারী ১৯৬৭) পৃ. ৪

১৮. মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল*. (কায়রো, ১৯২৩ খ্রি.) পৃ. ১৯

সমালোচককে সাহিত্যের মান অনুযায়ী সমালোচনা করতে হয়। কবিতাকে কবিতার মতো করে আবার উপন্যাসকে উপন্যাসের নিয়মানুযায়ী সমালোচনা করতে হয়। সঠিক সমালোচনার জন্য মূল লেখকের মান কখনো কখনো বেড়ে যায়। সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য লেখকের লেখায় আসে সাফল্য। সাহিত্যকর্মের মান নষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকে।[১৯]

দ্বিতীয়ত: সাহিত্যের মানদন্ড :

নু'আইমা ব্যক্তিগত ও আত্মসমালোচনার উপর জোর দেন। এবং বলেনঃ "ان لكل ناقد غرباله ولكل مقابيسه وموازينه"“প্রত্যেক সমালোচকের একটি চালুনি থাকা দরকার আর প্রত্যেকের থাকবে নির্দিষ্ট মান ও ভারসাম্য”।[২০] সকল সমালোচকের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যা হলো “বিচক্ষণতার সহজাত শক্তি” (قوة التميز الفطرية) কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমালোচকগন নিজেদের জন্য বিশেষ মান নির্ধারণ করে। এবং এর ফলে যে কেউ মন চাইলেই সমালোচক হতে পাওে না, তার জন্য দরকার হয় বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতি। যে এই মান না মানে সে সমালোচক হতে পাওে না। এতে তার সাহিত্য প্রতিভাব বা সাহিত্যের কোনো উন্নয়ন ঘটেনা।[২১] এজন্যই এ পদ্ধতিকে মুহাম্মদ মানদুর “আত্ম-প্রভাবমূলক পদ্ধতি”(المنهج التأثري الذاتي) বলে অভিহিত করেছেন। যা রোমান্টিক প্রবণতা নির্দেশ করে।[২২]

এক্ষেত্রে আমরা নু'আইমা'র দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সুস্পষ্ট দ্বৈততা দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার সমালোচকদের নতুন মান তৈরি করার আহবান জানান এবং বলেন, “যে সমালোচক অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে সমালোচনা করে সে নিজের, তার সমালোচনায় বা সহিত্যের কোনো উপকার করেনা। কোনো কিছুরই উন্নতি করেনা। কারণ সুন্দরকে সুন্দর থেকে আলাদা করার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, খারাপকে ঠিক পথে আনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। কারণ আমাদের সাহিত্য সমালোচনা বা সমালোচকের প্রয়োজনই হতো না যদি প্রতিটি পাঠক যা পড়ছেন সেখান থেকে ভালো-মন্দ গ্রহণ করার নিয়ম জানা থাকতো।

---

[১৯] প্রাগুক্ত. পৃ. ১৯-২০

[২০] প্রাগুক্ত. পৃ. ১৬

[২১] প্রাগুক্ত. পৃ. ১৭

[২২] মুহাম্মদ মানছুর, *আন্ নাক্দু ওয়ান নাক্কাদ আলমুহাসিরিন*, নাহদাতুল মিসর (কায়রোঃ ২০০২) পৃ. ২৬-২৯ (সমসাময়িক সমালোচনা ও সমালোচক)

তাহলে সেটাই সহজ হতো।[২৩] আবার নু'আইমা অন্য জায়গায় নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য বা সাহিত্যের মূল্যায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মান বা নিয়মের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন: "যদি এটা সত্যি হয় যে, আমাদের মূল্যায়নের মান, নৈতিক মান, রুচির পরিবর্তন স্থান ও সমায়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হওয়া ফ্যাশন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে ভালো ও মন্দের মধ্যে, উপকারী ও অপকারী জিনিসকে আলাদা করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার কী লাভ? অথবা যখনই আমরা সুন্দর এবং অসুন্দর, উপকারী ও ক্ষতিকারক, ভুল ও সঠিকের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করি তখনই কি আমরা খারাপ চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্ত হইনা? আমরা যাকে আজ সুন্দর, কল্যাণকর ও স্বাস্থ্যকর বলি সেটা যে আগামী কাল কুৎসিত, ক্ষতিকর ও কলুষিত হবেনা তার নিশ্চয়তা কে দিবে? সাহিত্য কি ফ্যাশন নয় যা সময়ের সাথে ম্লান হয় না এবং দিন দিন সাহিত্যের কেবল সৌন্দর্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে?[২৪]

মানষ তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কিছুর মান নির্ধারণ করে। নু'আইমা'র মতে, মানুষ সাহিত্য সহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ের মূল্য তার আধ্যাত্মিক চাহিদা অনুসারে পরিমাপ করে। এটা সত্য যে, বিভিন্ন সময়ে এবং অনেক জায়গায় জাতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। তবে এটাও ঠিক সাধারণ মানষের কিছু চাহিদা সবার জন্য অভিন্ন থাকে। আবার কিছু বিষয় থাকে যা কোনো জায়গায় বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল ক্ষেত্রেই সবার জন্য সে চাহিদা সমান থাকে। নু'আইমা যে চারটি প্রয়োজনের কথা আমাদেরকে বলেছেন, সেগুলো হলো : [২৫]

১. মানুষের নিজের সাথে যা ঘটছে তা প্রকাশ করার প্রয়োজন। যেমন তার আত্মার বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়, বিশ্বাস-সন্দেহ, ভালোবাসা-ঘৃণা, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ, হতাশা ইত্যাদি ব্যক্ত করার প্রয়োজন।

---

২৩. মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৭

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

২. মানুষের জীবনকে গাইড করার জন্য একটি আলোর প্রয়োজন। আর সেই আলো হলো সত্যের আলো। মানুষের নিজের মধ্যে যা আছে এবং চারপাশের জগতে যা আছে সেখানে সত্য ও ধার্মিকতা ছাড়া কোনো আলো নাই।

৩. সৌন্দর্যের জন্য আত্মার প্রয়োজন।

৪. সঙ্গীতের জন্য আত্মার প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে নু'আইমা তার নৈতিক মান নির্ধারণ করেন এবং অন্যদেরকে এগুলো প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান। আর সেটা হলো "একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি যা আমাদের অবশ্যই সাহিত্যের সাথে পরিমাপ করতে হবে।"[২৬] আর সেটা হলো: যেকোনো লেখার পর সেটার ব্যাপারে একজন ব্যক্তির অভিব্যক্তি কী? লেখকই বা তার লেখায় মৌলিক বা বাস্তবতার দিকে কতটা যত্নশীল অথবা মনোযোগ দিয়েছেন।

নু'আইমা'র মতে, এই চারটি বৈশিষ্ট্য না মানলে কোনো সাহিত্য-কর্মই সফল হবে না। শেক্সপিয়ারকে সেই লেখকদের একজন হিসেবে ধরা হয় যিনি তার রচনায় এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী ছিলেন। নু'আইমা'র মতে, তার লেখায় ছিল "যেকোনো কিছু প্রকাশের যথার্থতা, সৌন্দর্যের সমন্বয় ও সত্যের মাধুর্যতা। পৃথিবীতে আজও এমন কিছু কবি সাহিত্যিক রয়েছেন যারা মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ তার বাগ্মিতাকে সৌন্দর্যের সাথে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শেক্সপিয়ার তার রচনার লাইন বা অনুচ্ছেদে শুধু সৌন্দর্যের দিকে নজর না দিয়ে তাকে তথ্য দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তার উপন্যাসের দৃশ্য ও অধ্যায়গুলোকে তিনি এভাবেই সাজিয়েছিলেন। তাই শেক্সপিয়ার এখনও এমন তীর্থস্থান (পবিত্র ও সম্মানের স্থানে আসেন) যেখানে আমরা তীর্থযাত্রা করি, আমরা যাকে ভালোবাসি, আমরা যার জন্য প্রার্থনা করি।[২৭]

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০,৭১

নু'আইমা'র কথার যে দ্বৈততা সাহিত্যের মান সম্পর্কে তা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। শফি' আল-দীন আল-সায়্যিদ বলেন, নু'আইমা একদিকে যেমন আত্ম-সমালোচনার জোর দিয়েছেন আবার অন্যদিকে সাহিত্যের সঠিক মানদন্ডের প্রয়োজনের উপরও জোর দেন। এইদুটি দিক একটি আরেকটির বিপরীত। নু'আইমা এই মানদণ্ড থেকে সব জায়গায় সব সময় সঠিক বিষয়টি বেছে নির্ধারণ করার জন্য বলেছেন। আর এ ব্যাপারে সচেতনতা নির্ভর করে ব্যক্তির নিজের উপর।[২৮]

এটা স্পষ্ট যে আল-দীন আল-সায়্যিদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বোক্ত দ্বৈততাকে সরিয়ে দেয় না। নু'আইমা নিজেও এই মানদণ্ডের আপেক্ষিকতার উল্লেখ করেছেন। এবং স্বীকার করেছেন যে, সত্য সৌন্দর্য সুর ও ছন্দ একই বিষয়ের অন্তর্গত। সুতরাং সাহিত্যের মান বিষয়গত।[২৯]

আমরা ধরে নিলাম শফি আল-সায়্যিদের মতামত এবং নু'আইমা'র স্বীকারোক্তি বিদ্যমান দ্বৈততাকে অস্বীকার করে। তারপরে ও নু'আইমা'র দৃষ্টিভঙ্গির যে ত্রুটিগুলো থাকে সেখান থেকে আমরা যা, বুঝতে পারি তা হলো-

১. নু'আইমা সাহিত্যের যে মান নির্দেশ করে তা সত্য এবং সৌন্দর্য আপেক্ষিক। কিন্তু তার উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে সত্য ও সৌন্দর্যকে সাহিত্যের মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা চিরন্তন। তিনি বলেন, "....আমাদের বোধগম্যতা সত্য থেকে ভিন্ন হলেও আমরা অস্বীকার করব না যে, আদমের যুগে যা সত্য ছিল, আজও তা সত্য এবং সময়ের শেষ পর্যন্ত সত্যই থাকবে।[৩০] তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন, যদিও আমরা আমাদের রুচির ভিন্নতার কারণেই কাউকে সুন্দর মনে করি আবার কাউকে অসুন্দর মনে করি, তবুও আমরা ওই সত্য অস্বীকার করতে পারি না যে, জীবনের একটি পরম সৌন্দর্য রয়েছে যেখানে এ দুটির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।"[৩১]

---

২৮. সায়্যিদ শফি আল-দ্বীন, *আর রাবাতিয়্যাহ আল কলামিয়্যাহ ফী আন্ নাক্দ আল আরাবী আল হাদীস* (কায়রো: ১৯৭২) পৃ. ৩৭

২৯. মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমুআতি আল কালিমাহ্*, (বৈরুত :দারুল ইলম লিলমালাঈন , ১৯৭৪), নবম খণ্ড, পৃ. ৪৮২ এবং ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৮

৩০. মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৭

৩১. প্রাগুক্ত. পৃ. ৭০

যদি আমরা স্বীকার করি নেই যে, সত্য ও সৌন্দর্য জীবনের চিরন্তন সত্য যেমনটি নু'আইমা বলেছেন তাহলে আমরা সেগুলোকে নিখুঁত মানদণ্ডের মধ্যে বিবেচনা করতে পারি। এবং সেগুলোর মাধ্যমে সাহিত্যকে মূল্যায়ন করতে পারি। কিন্তু সেগুলোকে আপেক্ষিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করলে তার একটি নির্দিষ্ট মূল্যায়ন পাওয়া যাবে। কারণ দুটি রুচি ভিন্ন হবে। একজন যেটাকে সুন্দর মনে করবে অন্যজন সেটাকে অসুন্দর মনে করবে। তাহলে আমরা কী এখান থেকে সঠিক মতামতকে খারাপ মতামত থেকে আলাদা করতে পারিনা? আমরা কী এই সমালোচক যা বলেছেন তা বিশ্বাস করতে পারি না?

২. যদি সঙ্গীত সম্পর্কে আমরা নু'আইমা'র মতামতকে দেখি, যখন কেউ তার কথার মধ্যে কোনো ঘটনা উল্লেখ করেন তখন দুই ব্যক্তি এক অর্থ অনুধাবন কওে না, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনুধাবন করে। এবং যেকারো এটা বলার অধিকার আছে যে, সে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অনুধাবন করেনি।"[৩২] তাই সে বলতে পারে আমি এটাকে সঙ্গীত হিসাবে বিবেচনা করি না। এটা প্রায় সময়ই ঘটে থাকে যে, একটা সঙ্গীত একজন সমালোচককে সন্তুষ্ট করে আবার অন্যকে সন্তুষ্ট কওে না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন সমালোচকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন যেটা অনুভব করে অন্যজন সেটা অনুভব কওে না। তাই আমরা এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি সত্য, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আপেক্ষিক মানদন্ড যা সাধারণ নয়।

তৃতীয়ত ঃ গদ্য সাহিত্য সমালোচনা :

নু'আইমা সেই সাহিত্যিক পন্ডিতদের বিরোধিতা করেছে, যারা সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য সাহিত্য রচনা করে। যারা এটিকে শুধু একটা কাজ বা খেলা মনে করে। গুরুত্ব সহকারে শিল্প সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা করেনা। যারা الفن للفن " (শিল্পের জন্য শিল্প)এর জন্য নতুন অর্থ দিয়েছে। সাহিত্যকর্মকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসাবে নেয়নি। নু'আইমা রাশিয়ান লেখক ও সমালোচকদের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে একটি বাস্তববাদী মতামত গ্রহণ করেছিলেন।

---

[৩২] মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমুআ আল-কালিমাহ* আল হাদিস, নবম খণ্ড. প্রাগুক্ত. পৃ.৬২৩

তিনি বলেন, আমি গদ্য ও পদ্যের সাথে সাথে সমালোচনার ব্যাপারেও রাশিয়ান বাস্তববাদী পদ্ধতির অনুসরন করেছি।[৩৩] (فقد نجهت في القصة منهج الواقعية الروسية , وكذلك في القصيدة وكذلك في النقد)

বিশেষ করে নু'আইমা রাশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত সমালোচক হজ বেলিনস্কিকে অনুসরণ করতেন। যিনি সাহিত্য ও জীবনের পক্ষে কথা বলেছেন। এবং বিশ্বাস করতেন যে, জীবন ও সাহিত্য যমজ সহোদরের মতো।[৩৪]

নু'আইমা বিশ্বাস করতেন যে, অতীতে সাহিত্যের উন্নয়ন না হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। কেননা জীবন ছাড়া সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব নেই । এটি শরীরের জন্য পানি, বায়ু ও খাদ্যের মতো।[৩৫]

যে সাহিত্য জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেটা আসল সাহিত্যের যোগ্য নয়। সাহিত্য এমন এক বিষয় যা জীবনের অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক বিষয় নিয়ে কাজ করে। তাই সাহিত্য, এতটাই ব্যাপক যে, মানুষ যেখানেই থাকুক যেমন থাকুক সেভাবেই সাহিত্য রচিত হয়। কেননা সাহিত্য মানুষের অন্তরে একটি বার্তাবাহকের কাজ করে। বাস্তববাদী ও জীবনমুখী সাহিত্য বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট সময় ও বিশেষ কোনো শ্রেণির জন্য রচিত হতে পাওে না। বরং একটি সফল সাহিত্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থানকে অস্বীকার করে রচিত হয়।[৩৬]

নু'আইমা সেই লেখকদের প্রশংসা করতেন যারা জীবনকে তাদের সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখেন। কারণ তিনি নিজেই জীবনকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখেন। রাশিয়ার বিখ্যাতলেখক “পুশকিন” বলেছেন– “যখন আপনি নিয়মের দিকে দেখবেন মানুষের জীবন

---

৩৩. জোসেক খাওরি তাওক, *দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মিখাইল নু'আইমা*, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত : দার্নো প্রেস, ১৯৯৯) সপ্তম খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড. পৃ. ২৪

৩৪. প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫

৩৫. মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমুআ আল-কালিমাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৩

৩৬. জোসেফ আল খাওরি তাওক, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৯, মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল*, পৃ. ২৬-২৭, আল মাজমুআ আল কালিমাহ, ষষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৩৩৫ নবম খণ্ড পৃ. ৬৪৩

একধাপ থেকে অন্য ধাপে চলে যায়। নিয়ম একজন জাদুকরের জাদুর মতো চোখের পলকে মানবতা বিশালতায় আপনার সাথে ঘুরে বেড়ায়। এবং মানুষের জীবনের অনেক বিষয় দূর দিগন্তে সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মানুষের সাথে বাস করে।[৩৭] অন্য জায়গায় তিনি গোর্কি, টলস্তয়, তুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্কি এর মতো রাশিয়ান লেখকদের প্রশংসা করেছেন। যারা জীবনমুখী সাহিত্যের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা জীবনকে সাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত করতে কার্পণ্যবোধ করেননি। তারা শুধু রাশিয়ান মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলেননি বরং তারা রাশিয়ান মানুষের সাথে সাথে সাধারণ সকল মানুষের সমস্যা, পার্থিব ব্যবস্থার সমস্যাগুলো বর্ণনা করেছেন, জীবন-মৃত্যুর সমস্যা ও যে সমস্যা মানুষ তৈরি করেছে এগুলো হলো বাস্তবমুখী সমস্যা।[৩৮]

কবিতাও সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সাথে তিনি কবিতা নিয়ে ও অনেক কাজ করছেন। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

চতুর্থতঃ কবিতা [৩৯]

নু'আইমা এমন কবিদের সমালোচনা করেছেন, যারা কবিতার প্রকৃত ধারণা সম্পর্কে খুব কম বোঝেন। যারা কবিতা রচনার ব্যাপারে কোনো নিয়ম কানুনই মানেন না। তিনি কবিতার নিয়মতান্ত্রিকতা বা বিন্যাসের ব্যাপারে বলেছেন। তিনি দেখেন যে, কবিতার বিন্যাসের ব্যাপারে গুণ ও মানের প্রতি কবিদের মনোযোগের অভাব। যে ব্যাপারে সাধারণ মানুষ হতাশ হচ্ছে। এমনকি টলস্তয় এর লেখকরাও কবিতার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ পান না, এর কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

---

৩৭. মিখাইল নু'আইমা, ফি আল গিরবাল আল জাদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৩৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৯
৩৯. মিখাইল নুআইমা, আল গিরবাল, পৃ. ৭৫-৮৯, ১২৫-১২৯-১৪৪, *আল মাজমুআ আল কালিমাহ*, নবম খণ্ড পৃ. ৬১৩-৬১৪

কিন্তু যদি কবি ও লেখকরা এই শিল্পের গুরুত্ব ও মূল্য জানত, যদি এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতো। তারা যদি জানতো যে, "যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন মানুষের মধ্যে কবিতা প্রতি ভালোবাসার সহজাত প্রবণতাও থাকবে, তা দুঃখ হোক বা আনন্দ হোক। এবং যতদিন আবেগও চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষা থাকবে ততদিন কবিতাও থাকবে।"[৪০]

নু'আইমা সাহিত্যের অন্যতম শাখা কবিতার ক্ষেত্রেও জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর জোর দেন। কবিতাকে আত্মার ভাষা (لغة الحياة) জীবনের শ্বাস প্রশ্বাস (نمسة الحياة) ও কবিকে আত্মার ব্যাখ্যাকারী (ترجمان النفس) হিসেবে মনে করা হয়। তার মতে, কবিতার মাধ্যমেও ব্যক্তি ও জীবনের সকল দিক প্রকাশ করা উচিত। তিনি বলেছেন, "কবিতা সম্পর্কে আমার মতামত হলো কবিতা হলো কবির আত্মায় বিচরণকারী চিন্তা ও অনুভূতির প্রতিফলন। জীবনের বিভিন্ন যে সমস্যা তৈরি হয় একজন কবি সেগুলো কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।[৪১]

অন্য আরেক জায়গায় তার সূফি দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন, কবিতার মাধ্যমে তিনি জড় বস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণী, মহাবিশ্বের সবকিছুকে আলিঙ্গন করার চিরন্তন আকর্ষণ অনুভব করেন।[৪২]

কবিতা শুরু থেকে তিনি যে সকল বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন সেটা হলো কবিতার ছন্দ ও তার স্থান। এ ব্যাপারে এখানে আমরা সংক্ষেপে তার কিছু মতামত তুলে ধরছি।

---

৪০. মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৭৬

৪১. মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমুআ আল কালিমা*, নবম খণ্ড, প্রাগুক্ত. পৃ ৬১৩-৬১৪

৪২. মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৭৬

কবিতায় ছন্দের ব্যাপারে নু'আইমার মতামত :

নু'আইমা লক্ষ্য করেন যে প্রথম দিকে কবিরা তাদের চিন্তাভাবনা ও আবেগ প্রকাশের সুবিধার্থে ছন্দ ব্যবহার করতো। কিন্তু খলিল বিন আহমাদ আল ফারাহিদি কাব্যশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তুলে ধরেন। অন্তমিল ও ছন্দ কবিতার এক অন্যতম বিষয়, আগে কবিতায় এগুলোকে অধিক গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো না যতাটা বর্তমানে করা হচ্ছে। বর্তমানে দিন দিন কবিতায় ছন্দ ও অন্তমিল কবিতার কারুকাজে পরিণত হয়েছে। যে মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এটা কবিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং অন্য শিল্প থেকে আলাদা করেছিল।[৪৩]

নু'আইমা কবিতার ছন্দ ও অন্তমিল সম্পর্কে দুই ধরণের মতামত প্রকাশ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "কবিতায় ছন্দ বা ওযন আবশ্যকীয় বিষয়। কিন্তু কবিতায় অন্তমিলের তেমন কোনো প্রয়োজন নাই। বিশেষ করে আরবি কবিতায় অন্তমিলের কোনো প্রয়োজন নেই।[৪৪] তার মতে যতক্ষণ কবিতায় ছন্দের সীমাবদ্ধতা ভাঙ্গা যাবে না ততক্ষণ কবিতায় বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়।

আবার অপর জায়গায় নু'আইমা বলেছেন, কবিতার জন্য ছন্দ কিংবা অন্তমিলের কোনোটারই প্রয়োজন নাই। যেমন নামায বা ইবাদতের জন্য কোনো উপসনালয় বা মন্দিরের প্রয়োজন নাই। ইবাদত যেকোন জায়গায় করা যায়।[৪৫] যদিও তিনি তার কবিতায় এগুলো ব্যবহার করেছেন। কবিতায় তিনি প্রয়োজনীয় সুর, ছন্দ,ওযন, অন্তমিল ব্যবহার করেছেন।[৪৬] নু'আইমা আরও বলেছেন, আমি কখনো কবিতায় ছন্দ ও অন্তমিলের মুখাপেক্ষিতার কথা বলিনি।[৪৭]

সবশেষে এটা বলা যায় যে, কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ ও অন্তমিলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে এটা ব্যবহার করা উচিত। নু'আইমা'র এ মতের পক্ষে কথা বলেছেন।

---

[৪৩] জোসেফ আল খাওরি তাওক, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৬ এবং মিখাইল নু'আইমা, *আর গিরবাল*, পৃ. ১০৯ ,১১১ ,১১৬-১৯০ ও ১৪০, *আল মাজমুআ আল কালিমাহ*, নবম খণ্ড পৃ. ৫১৩

[৪৪] মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল, (কায়রো, ১৯৩২খ্রি.) ,প্রাগুক্ত. পৃ. ৮৫

[৪৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

[৪৬] জোসেফ আল খউরি তাওক, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৬

[৪৭] মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমুআ আল কালিমা*, নবম খণ্ড. পৃ. ৬১৩-৬১৪

পঞ্চমত : সাহিত্যের ভাষা নিয়ে সমালোচনা[৪৮]:

নু'আইমা'র মতে ভাষা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। ভাষা এমন একটি জিনিস যা মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে এবং মানুষের জীবনের বিকাশের সাথে সাথে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। জীবনের তাগিদ অনেক শব্দের সংযোজন বা বিয়োজন ঘটে। কৃষ্টি, কালচার, ঐতিহ্যের সাথে সাথে ভাষার মধ্যেও অনেক নতুনত্ব আসে।

নু'আইমা এটাও ব্যক্ত করেন যে, আরবী ভাষা আধুনিক বিকাশের সুযোগ পায়নি। এখনও অতীতের নিয়মানুযায়ী চলছে। পুরনো নিয়ম রীতি যেমন রুপতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত নিয়মগুলোকে তিনি "ভাষার বোঝা" বলে মনে করেন। আধুনিকতায় পৌছানোর জন্য এই ভাষায় কোন কাজ করা হয়নি। ভাষাতাত্ত্বিকদের হাতে পুরনো নিয়মকানুন গুলোই রয়ে গেছে। অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলনীয়, ফিনিশিয়ান ও অন্যান্য ভাষার মতো আরবীর প্রাচীন শব্দগুলো আরবী ভাষা থেকে মুছে ফেলা উচিত।

কেননা যারা এসব ভাষায় কথা বলতেন তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নু'আইমা ভাষাবিদদের সমালোচনা করেছেন কারণ তারা ভাষার বিকাশের জন্য তেমন কোন কাজ করেননি এবং অভিধানে নতুন শব্দ রেকর্ডের ব্যাপারেও তাদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। যদি তারা ভাষা পাঠের ব্যাপারে মনোযোগী না হয় কোথায় সংক্ষিপ্ত "তা" (ة) এর পরিবর্তে দীর্ঘ "তা" (ت) ব্যবহৃত হয়েছে আবার কোথায় সংক্ষিপ্ত আলিফের পরিপর্তে বর্ধিত আলিফ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ভাষার অভিধানে এর প্রয়োজনীয়তা না বুঝে ব্যবহার করলে, সে ভাষার শব্দভাণ্ডার হবে দুর্বল।

---

[৪৮] মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল পৃ. ২৯-৩৬, ৯০-১৩৬,২০২, মিখাইল নু'আইমা, ফী আল গিরবাল জাদীদ পৃ. ৫৯-৬০, আল মাজমু'আ আল কালিমাহ, নবম খণ্ড, পৃ ৫৩৪,৫৩৫,৫৩৮,৫৩৯,৬৯৭

ভাষাবিদরা যে ভাষায় কথা বলেছে বা লিখছে তা অতীতের ভাষা থেকে ভিন্ন, কোনো শব্দের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়েছে তা বুঝতে হবে। যদি তারা ভাষার অখন্ডতার উপর জোর দেয় তাহলে বুঝতে ভাষা উন্নয়ন থেকে দূরে। যেমন তারা বর্তমানে العلوج এর পরিবর্তে العصا (লাঠি) ও الخنسليل এর পরিবর্তে السيف (তরবারি) ব্যবহার করে। ভাষাবিদদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে কবিতার ভাষাও পরিবর্তন ও বিকাশ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আল মুতানব্বীর “মুআল্লাকাতের” ভাষা ও আন্দলুসীয় কবিদের কবিতার ভাষা পূর্ববর্তী ইসলামী ও জাহেলী যুগের কবিদের কবিতার ভাষা থেকে আলাদা।

নু'আইমা সেসব আরব ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, যারা “পরিমার্জিত শব্দের অধ্যায়” নামে আলাদা একটি অধ্যায় শুরু করেছিলেন। তিনি একবার জিবরান খলিল জিবরানের একটি কবিতার একটি শ্লোকে সমালোচকদের তিনি সমালোচনা করেন। কবিতাটি ছিলো এইরকম,

هل تحممت بعطر * وتنشفت بنور

"তুমি কী সুগন্ধি দিয়ে স্নান করেছো* আর আলো (রোদ) দিয়ে শুকেছো?"

এই বিখ্যাত কবিতাটিতে লেবাননের পাহাড়, খাঁড়ি, উপত্যকার কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে আপনি আপনার অস্তিত্বের ঘ্রান পাবেন। কিন্তু এই কবিতার সমস্যা হলো এখানে ভাষাগত ভুল আছে। কিন্তু একজন কবি কি কোনো নতুন শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন না?

সমালোচকরা দেখেন যে অভিধানে تحمم (স্নান) শব্দটি নেই। তারা বলেন জিবরানের “تحمم” শব্দটি ব্যবহারের পরিবর্তে “استحم” শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিল। নু'আইমা সেই সকল সমালোচকদের সমালোচনা করে বলেন, আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি একজন ভদ্রলোক, জ্ঞানী ব্যক্তিকে কেন অভিধানের নামে একজন বেদুইনের জন্য যাকে চিনে না, জানে না এমন ব্যক্তির জন্য “استحم” শব্দটি ব্যবহার করতে হবে? এবং একজন পরিচিত কবি যাকে আপনি জানেন, চিনেন কেন সে “تحمم ” শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না? আপনিতো বুঝতে পেরেছেন যে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন।

আপনি "استحم শব্দটি বোঝার আগে "تحمم " শব্দটি বোঝেন। আর কী এক চিরন্তন নিয়ম যা আপনার ভাষার সাথে হাজার হাজার বছর আগে বসবাসকারী এক বেদুঈনের ভাষার সাথে সংযুক্ত করে এবং কোনো সমসাময়িক কবির ভাষার সাথে সংযুক্ত করে না? [৪৯]

নু'আইমা'র মতে আজকে যে আরবী ভাষায় লেখালেখি হচ্ছে তা লেখকদের চাহিদা মেটাতে পারে না। কারণ শিল্প সাহিত্যে বিশেষ করে নাটক বা অভিনয় শিল্পে কথ্যভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন অনেক। একজন অভিনেতাকে সাধারণ মানুষের চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্য অবশ্যই দৈনন্দিন মুখের ভাষাই ব্যবহার করতে হয়। নাট্যকারদের এই বিষয়ে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। আর যদি গুরুত্ব না দেয় সব চরিত্রের লোকদের যদি একই ভাষায় কথা বলতে হয়, তবে সে কাজ বা নাটক সফল হবেনা। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষক যদি একটি নাটকে শুধু শাস্ত্রীয় ভাষায় কথা বলেন তবে তিনি যা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন অথবা জীবনের যে বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছেন সেটা সম্ভব হবে না। নু'আইমা রচিত পিতা ও পুত্র (الاباء والبنون) নাটকে শিক্ষিত লোকের চরিত্রে শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষা বা শুদ্ধ ভাষা আর নিরক্ষর চরিত্রে কথ্যভাষা বা তাদের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি এটাও বলেছেন ভাষার এসকল সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ভাষাকে স্থানীয় ভাষা থেকে কিছু শব্দভাণ্ডার ধার করতে হয়। কেননা আঞ্চলিক ভাষায় মানুষের চাহিদা ও তাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করার এক দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে। এজন্য সাহিত্য রচনার জন্য অবশ্যই স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা থেকে কিছু শব্দ নিতে হবে। তবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে সে শব্দগুলোর রূপতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করে সেগুলো নির্বাচন করতে হবে। কারণ আঞ্চলিক বা কথ্যভাষা এমন একটি ভাষা যা স্থানীয় লোকদের দ্বারা উদ্ভুত এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাথে সাথে বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশ সময়ের সাথে সাথে দ্বিগুণ হয়। তাই ভাষাও মানুষের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলে ভাষার বিকাশও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

---

৪৯. মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০০

নু'আইমা বলেন যারা কথোপকথনের মধ্যে আরবী ও ইংরেজী ভাষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে কথা বলে তারা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত নিয়ম বুঝেই বলে।

নু'আইমা এটাও পর্যবেক্ষণ করনে যে, আরবদের মাঝে প্রচলিত উপভাষাগুলোর মধ্যে একটার সাথে অন্যটির মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু উপভাষা আছে যা অন্য উপভাষার লোকেরা বোঝেন না। তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষা মানুষের দৈনন্দিন বিষয় প্রকাশে শাস্ত্রীয় ভাষার চেয়ে বেশি সফল। কেননা শাস্ত্রীয় ভাষা নগর উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পাওে না। তবে চলতি ভাষা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকায় লিখতে সমস্যা হয়। তাই সাহিত্য রচনার সময় ধ্রুপদী ভাষা ব্যবহার করা ভালো। কারণ এর একটি শিকড় আছে, নিয়মকানুন আছে। অপরদিকে শাস্ত্রীয় ভাষা মানুষের জীবনের বাস্তবতা সবসময় প্রকাশ করতে পারেনা, ফলে এটা জীবন থেকে দূরে সরে যায়।

নু'আইমা'র সমালোচনামূলক এই আলোচনায় তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হলোঃ সাহিত্যেও বিষয়, সাহিত্যের মান ও ভাষা। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে নু'আইমা'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল সাহিত্যের মান নির্ধারণ করা।

তিনি জীবনের সাথে সাহিত্যকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন। নু'আইমা "সাহিত্য পরিবেশের সন্তানতুল্য" এই স্লোগানে বিশ্বাসী ছিলেন। আমরাও এ আলোচনা শেষে বলতে পারি যে, সাহিত্য আসলে জীবনের প্রতিধ্বনি। তবে নু'আইমা এ জীবনকে বিস্তৃত হিসেবে দেখেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে অবশ্যই সময় স্থান ও বিশ্বের সব মানুষকে সংযুক্ত করতে হবে। কোন বিশেষ শ্রেণির মানুষ নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারেনা। সাহিত্য হবে সার্বজনীন, সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, সমাজের দর্পণ হবে সাহিত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"গিরবাল" এ মিখাইল নু'আইমা'র সাহিত্য সমালোচনা

মিখাইল নু'আইমা'র এক অনন্য কালজয়ী সমালোচনামূলক গ্রন্থ হলো *"আল গিরবাল"*। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সমালোচনাসাহিত্যকে অনুকরণের শেকল থেকে মুক্তি দিয়ে সময়ের সাথে সাথে আধুনিক করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তিনি সাহিত্যের জন্য সাধারণ মান নির্ধারণ করেছেন, কবিতার ভাষা ও সুর, ছন্দ, অন্তমিল কেমন হবে সেসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের তাত্ত্বিক মতবাদ ও পাশ্চাত্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

আল গিরবাল (الغربال)

" আল গিরবাল " (الغربال)" (চালুনী) হলো মিখাইল নু'আইমা রচিত একটি বিখ্যাত সমালোচনামূলক গ্রন্থ। الغربال শব্দের বাংলায় অর্থ হলো চালুনি। যা দ্বারা কোনো কিছু ছেঁকে নেয়া হয়। একটি চালুনিতে ভালো জিনিসকে খারাপ থেকে ছেঁকে আলাদা করা হয়।[৫০] একজন সমালোচককে তিনি এ চালুনি দিয়ে ছাঁকেন। মন্দ থেকে ভালোকে বের করে নিয়ে আসেন। "আল গিরবাল" বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এই বইটিতে বাইশটি প্রবন্ধ রয়েছে। কিছু প্রবন্ধ নু'আইমা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। আবার কিছু তিনি বিভিন্ন বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন।[৫১] তিনি এই বইতে সাহিত্যের মান, কবিতা ও কবি, আরব উপন্যাস সহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে কথা বলেছেন। তার এই বইটিতে একটি প্রবন্ধ আছে যেখানে তিনি বিদেশী সাহিত্যের উপর অনুবাদের আহ্বান জানিয়েছেন। যার শিরোনাম হলো "আসুন অনুবাদ করুন"।[৫২] আবার কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে তিনি আরবী সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য আলোচনা

---

[৫০] ইবন্ মানযুর, আবুল ফাদ্ল জামাল আদ-দ্বীন মুহাম্মদ বিন মুকাররম, *লিসানুল আরব* (বৈরুতঃ দারুস সাদের ১৯৯৭), ১১তম খণ্ড ,পৃ. ৪৯১

[৫১] মুহাম্মদ মানছুর, আন নক্দ ওয়ান নাক্কাদ আল মুআসিরিন. পৃ. ২০

[৫২] প্রাগুক্ত পৃ. ২৪

করেছেন। যেমন: والحباحب , نقيق الضفادع প্রবন্ধ। কিছু প্রবন্ধ সমসাময়িক সাহিত্যের সাথে ব্যাবহারিক সমালোচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন: القوربات যা কবি রশিদ সেলিম আল খাওরির কবিতার সংকলন, আরেকটি প্রবন্ধের নাম (الريحاني في العالم) যা জিবরান খলিল জিবরান দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

“ابتسامات ودموع” প্রবন্ধটি ম্যাক্স মুলারের রচিত “জার্মান লাভ" বইটি সম্পর্কে লিখেছেন। “غاية الحياة” হলো মিশরীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসমাই দ্বারা উপস্থাপিত বক্তৃতা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ।

النبوغ প্রবন্ধটি লেখক লবিব আল রিয়াশি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। “شكسبير خليل مطران” হলো খলিল মুত্রানের দ্বারা অনুদিত শেক্সপিয়রের “দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস” নাটক সম্পর্কে রচিত একটি নিবন্ধ। জিবরান খলিল জিবরানের عواصف العواصف শিরোনামে একটি নিবন্ধ, আল আক্কাদের الفصول নামে একটি নিবন্ধ ও নাসিব আরিদার দিওয়ান উপর الحائرة الأرواح নামে একটি নিবন্ধ রয়েছে। আহমদ শাওকির উপর الدرة الشوقية নামে একটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ রয়েছে।[৫৩]

গিরবালে একটি বড় অধ্যায় রয়েছে, “The Croaking of Frogs : Position of Language in Literature” যা বইটিকে এবং নু'আইমাকে অমর করে রাখার জন্য যথেষ্ট। এখানে তিনি সাহিত্যের ভাষা সংশোধন করে বলেন, “এটি গ্রহণযোগ্য এবং এটি নিষিদ্ধ, এটি বলা যাবে আর এই শব্দ বলা যাবে না, এটি আল আসমাই অনুসারে সঠিক আর এটি নয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।” আপনি কি উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত ভাষার নিয়ম ভাঙতে সাহস করবেন না? আরবী ভাষার কোনো পরিবর্তন হবে না নাকি শতাব্দীর পর শতাব্দী যেভাবে চলে আসছে সেভাবেই চলবে?”

আধুনিক সাহিত্য যদি পশ্চিমা সাহিত্যের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফল, তবে নু'আইমা সে সাহিত্যের সাথে রাশিয়ান সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়েছেন। তিনি ইউরোপ ও

---

[৫৩] প্রাগুক্ত পৃ. ২৩-২৪

আমেরিকান সাহিত্যে রোমান্টিক যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। দুটি সংস্কৃতিকে একত্রিত করেছেন অর্থাৎ পাশ্চাত্য ও পূর্বকে একত্রিত করেছেন নু'আইমা'র আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গঠন ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কারণ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের ঐতিহ্যের সাথে নিজের সংস্কৃতিকে এবং রাশিয়ান ঐতিহ্যের সাথে ইউরোপীর-আমেরিকান ঐতিহ্যেকে একত্রিত করেছেন। এটি তিনি আত্মাধিক চিন্তা গঠনের জন্য করেছিলেন। এবং তিনি খ্রিস্টধর্মের পূণ্যের জন্য তাদের পবিত্র বই বিশেষ করে ওল্ড টেস্টামেন্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[৫৪] দুটি সংস্কৃতির মিলন তাকে কবিতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির তৈরি করতে সক্ষম করে। কবিতাকে অতীতের পুরনো বিষয়বস্তু থেকে মুক্ত করে মানুষকে সাহিত্যের কেন্দ্র হিসেবে এবং জীবনকে তার বিষয় হিসেবে নিয়ে আসে।

'আল গিরবাল' এমন একটি বই যা প্রবাসী সাহিত্যের জন্য বিশেষ করে আরব লেখক সংঘের জন্য একটি সমালোচনামূলক সংবিধান রচনা করে। সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নের জন্য ও সাহিত্যের সমালোচনা যেন সঠিক পদ্ধতিতে হয়, সমালোচনার মাধ্যমে যেন সাহিত্যের উন্নয়ন ঘটে এই লক্ষ্যেই তিনি এই বইটি রচনা করেন।

---

[৫৪] প্রাগুক্ত পৃ. ৪০

সাহিত্যের মান সম্পর্কে নু'আইমা'র মতামত :

নু'আইমা'র সাহিত্যের মান ছিলো ঐতিহাসিক পরিবেশ, প্রকৃতি, সাহিত্যের দর্শন, সচেতনতা ও জীবন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। সাহিত্যের মান সাহিত্যের পাঠ্য ও শৈল্পিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত যা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখী করে তোলে। নু'আইমা তার *গিরবাল* বইতে আধ্যাত্মিক মানের জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন সবধরণের জিনিসেরই দুটি মূল্য আছে। একটি আধ্যাত্মিক ও অপরটি বস্তুগত। বস্তুগত মূল্যবোধের জন্য আমরা গঠনগত পরিমাপ অনুযায়ী নির্ধারণ করি আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে উপাদান আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নয়ন ঘটাই।[৫৫]

সাহিত্যে হলো একটি শিল্প এবং নু'আইমা'র মতে শিল্পের মূল্য হবে আধ্যাত্মিক এবং সাহিত্যের মূল্যও হবে আধ্যাত্মিক। আর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো স্থির নয় বরং মানুষের অনুভূতি,অর্থ, বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র অনুসারে মানুষের রুচিও বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। নু'আইমা বলেছেন, জীবনের শিল্পকলা ও সাহিত্যের আধ্যাত্মিক মূল্যছাড়া কোনো মূল্য নেই।[৫৬] সাহিত্যের মানদণ্ড আধ্যাত্মিক মূল্যের মানদণ্ড থেকেই নির্ধারিত হয়। তিনি বলেনঃ আমরা কীভাবে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধকে মূল্যায়ন করবো? এগুলোর ছোট না বড় বিষয়ের প্রেক্ষিতে? না অর্থের ভিত্তিতে? না এর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে, না এর উপকারীতার উপর নির্ভর করে? এগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট স্কেল দ্বারা মূল্যায়ন করা অসম্ভব। কেননা এটা নির্ভর করে পাঠকের রুচির উপর। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন মানুষের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন হয়।[৫৭]

সাহিত্যের যে প্রচলিত মানদণ্ড ছিলো নু'আইমা সেগুলোকে দূর্বলতা বর্ণনা করেছেন। কারণ সাহিত্যের মানদণ্ড সময়ের সাথে সাথে নবায়ন, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। তাই তিনি বলেন: "এটা আসলে একটা নিয়ম ছাড়া কিছুই নয় যে, এটি দিন, স্থান, রুচি ও উপলব্ধি পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তি হয়। তাই বিষয়গুলোর মধ্যে ভালো ও মন্দকে আলাদা করার প্রচেষ্টায় কি

---

[৫৫] মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল* (বৈরুত: নোফাল ফাউন্ডেশন ১৯৯১) , সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ৬৬
[৫৬] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭
[৫৭] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭

লাভ?”[৫৮] নু'আইমা এর মাধ্যমে সাহিত্যের নতুনত্বের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। যার কাজ সাহিত্যের বিষয়বস্তু থেকে ভালো, মন্দ, উপকারীতা ও অপকারিতা সনাক্ত করা।নু'আইমা যে সাহিত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, সেটা হলো সাহিত্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত মানদন্ড। তিনি বলেছেন সাহিত্য এমন কোন পদ্ধতি নেই যা সময়ের সাথে সাথে পুরনো হয়না বরং আগেরগুলোর সৌন্দর্য ও প্রতিপত্তিই বৃদ্ধি করে।”[৫৯]

নু'আইমা এক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকদের লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন: মুআল্লাকাতে কবিতা, আবুল আলা-মাআরির, কায়েস-আল-আমিরি, আল ফারিদ, হোমারের ট্রয় সম্পর্কে লেখা ও শেক্সপিয়ারের লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাদের লেখা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, সাহিত্য শিল্পের এই কাজগুলি নান্দনিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করেছে। এই রচনাগুলো পাঠককে সেসময় আনন্দ দিয়েছে এবং আমাদের সময়ে এগুলো আমাদেরকে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দেয় ও দিন দিন নতুনত্ব লাভ করে। তিনি চিরন্তন পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব দেন যা কোনো সময় ও স্থান মানে না। এমন এক পদ্ধতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন যার মাধ্যমে সাহিত্যের মান স্থির থাকবে। সময়, স্থান, জীবনের পরিবর্তন ও মানুষের রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরির্বতিত হবে না। বরং আমাদের জীবন, আমাদের অনুভূতি প্রকাশ, আত্নিক বিষয় ও আধ্যাত্মিক শক্তি যতদিন থাকবে ততদিন সেই একই মানদণ্ড ও থাকবে।[৬০]

নু'আইমা তার *“আল গিরবাল”* বইতে শিল্প সাহিত্যের চিরন্তনতা বা অমরত্বের কথা বলেছেন। তিনি অনেক উদাহরণের মাধ্যমে সাহিত্য ও শিল্পকলার চিরন্তন পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেছেন।

তিনি প্রাচ্যের সাহিত্যের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্য পাঠকের চাহিদানুযায়ী অমর সাহিত্যকর্ম তৈরির জন্য কাজ করেছেন। এবং সাথে সাথে পুরনো নিয়ম নীতির বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে সাহিত্যের অমরত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তবে এই নিয়মটি রোমান্টিসিজমের জন্য আলাদা হবে।

---

[৫৮] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭
[৫৯] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮
[৬০] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮-৬৯

কেননা তিনি বলেছেন “রোমান্টিক রচনায় প্রশ্ন, বিস্ময়বোধ ও আবেদন বিভিন্ন কিছু প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়। রোমান্টিক শৈলী একক কোন নিয়ম অনুসরণ কওে না। কারণ লেখক অনুযায়ী এই লেখাও পরিবর্তন হয়। যেমন একজন আবেগপ্রবণ লেখক থেকে একজন বিদ্রোহী মনোভাবের লেখক, একজন বিদ্রুপাত্মক লেখকের চেয়ে একজন শান্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ লেখক সম্পূর্ণ আলাদা।[৬১]

সকল সাধারণ মানুষ ও তার প্রয়োজনের সাথে নু'আইমা কালজয়ী সাহিত্যের মানকে সংযুক্ত করে। এই প্রয়োজনগুলো হলো নির্দিষ্ট মানের যার দ্বারা সাহিত্যের মানদন্ড পরিমাপ করা হয়।[৬২] এবং তিনি কিছু আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা বলেছেন। যেমনঃ

প্রথমতঃ- আমাদের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো প্রকাশ করার প্রয়োজন যা আমাদেরকে সহযোগীতা করবে। যেমনঃ আশা-হতাশা, ব্যর্থতা বিশ্বাস, সন্দেহ, প্রেম-ঘৃণা, আনন্দ- বেদনা, দুঃখ-আনন্দ, ভয়-প্রশান্তি, আবেগ সকল কিছু।[৬৩]

এই প্রয়োজনে আমদের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মতবাদের সীমানা অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু আমাদের ব্যথিত করে তা প্রকাশ করা প্রয়োজন। নু'আইমা সাহিত্যের সাথে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে যুক্ত করার কথা বলেছেন। তিনি ক্ষয়িষ্ণু জীবনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন আশা, হতাশা, ব্যর্থতা এই কারণ গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সবগুলোই হলো আবেগ।[৬৪] রোমান্টিক সাহিত্য আবেগের উপর নির্ভর করে এবং আবেগ তার প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র ও বিষয়গত। নু'আইমা'র মতে, এই সূত্রটি আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভিন্ন নয়, এটি আদর্শবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি।[৬৫] সাহিত্য হলো আত্মার প্রকাশ অর্থাৎ আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ।

---

৬১. মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, রোমান্টিসিজম (কায়রোঃ নাহদাতু মিসর) পৃ. ২১৫
৬২. মিখাইল নু'আইমা, আল-গিরবাল, . প্রাগুক্ত পৃ. ৬৯-৭০
৬৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৯-৭০
৬৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৭০
৬৫. শুকরি আজিজি আল-মাদি, *ফি নাজরিয়াতে আল আদাব*, ভলিউম-১ (বৈরুতঃ দার আল মুনতাখাব আল-আরবী, ১৯৯৩ খ্রি.) পৃ. ৫১

সাহিত্যে হলো অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিজ্ঞান।[৬৬] আবেগের উপর সাহিত্যের মান নির্ভর করে যা যুগে যুগে সাহিত্যেকে অমর করতে অনুপ্রাণিত করে।[৬৭] সাহিত্যের কাজ হলো আবেগকে অনুপ্রাণিত করা যা রোমান্টিক মতবাদের বিষয়।

নু'আইমা আবেগের প্রয়োজনীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি সংযুক্ত করেছেন। তবে তিনি এর বিশদ বিবরণ না দিলেও এর উপাদানগুলোর বর্ননা করেছেন, যা সমালোচকরা চিহ্নিত করেছেন। যেমন সততা, শক্তি, স্থিতিশীলতা ও উচ্চতা। তিনি এর অবস্থান এবং কাব্য পাঠের অন্যান্য উপাদানের সাথে এর সম্পর্ক স্পষ্ট করেননি। উত্তর ও পশ্চিমের প্রবাসী লেখকরা তাদের আবেগের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। সেখানে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয় দ্বারা অনুপ্রানিত হননি।

প্রবাসী লেখকরা তাদের দেশ ত্যাগ করেছিল ধর্মীয়, সামাজিক দ্বন্দ্ব, উচ্চকাংখা, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে। তাই তাদের রোমান্টিক সাহিত্যে কেবল একটি সাহিত্যিক মতবাদই নয়, বরং একটি দর্শন এবং জীবনধারা বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয়তঃ

আবেগ: জীবন চলার পথে আমাদের এমন একটি আলোর দরকার যা আমাদের পথ দেখাবে। সেখানে সত্যের আলো ছাড়া আর কোনো আলো নাই যা আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আর সেই সত্যের আলো হলো আমাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তার বাস্তবতা ও পৃথিবীর চারপাশে যা আছে তার বাস্তবতার আলো।[৬৮]

---

[৬৬] প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩

[৬৭] আহমদ আশ শুয়াইব, *উসুলুস নাক্দ আর আদাবী*, (বৈরুতঃ মাকতাবাতু নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৩) দশম সংস্করণ, পৃ. ২১

[৬৮] মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৭০

নিঃসন্দেহে সত্যের জ্ঞান সম্পর্কে একজন দার্শনিক, লেখক, সমালোচক ও চিন্তাবিদকে তার বিবেকই বলে তাদের আবেগ, অনুভূতিকে শিল্প, তত্ত্ব ও সাহিত্যের মতবাদের সাথে যুক্ত করতে আর সত্য জ্ঞানের পথ হলো অনুভূতি। হেগেল শিল্পকে সত্যের একটি বিশেষ দিক হিসেবে দেখেন। অভিব্যক্তি প্রকাশের নীতি হলো হৃদয় দিযে প্রকাশ করা। নিশ্চয়ই হৃদয় হলো সত্যের আলো প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।[৬৯]

আলফ্রেড ডি মুসেন্ট বলেছেন: সৌন্দর্য ছাড়া কোনো বাস্তবতা নেই, আবার বাস্তবতা ছাড়া কোনো সৌন্দর্যও নাই।[৭০] তবে এটাও সত্য যে, রোমান্টিক লেখকরা তাদের সাহিত্যে সেই সত্যের অনুসন্ধান করে না যা মানুষকে বিনয়ী করে তোলে। প্রচলিত যুক্তি অনুযায়ী তারা যে সত্যের সন্ধান করে তা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যা লেখকের কল্পনা ও আবেগের কাছে বন্দী। আবার কখনো বা সেটা বিদ্রোহী হিসেবে নতুনভাবে আর্বিভূত হয়।[৭১]

তৃতীয়ত ঃ

সৌন্দর্য :

সবকিছুতে সৌন্দর্যের প্রয়োজন। এমনটি যদি আমাদের রুচির মধ্যে আমরা কোনটিকে সুন্দর ও কোনটিকে অসুন্দর মনে করি তবুও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জীবনে আমাদের এমন এক পরম সৌন্দর্য রয়েছে যেখানে আসলে এ দুটি রুচির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৭২]

সৌন্দর্যের ধারণা মূলত গ্রীকদের থেকে উদ্ভুত হয়। হেগেল বলেন যে, শিল্পের বিষয়বস্তু আসলে স্বাধীন। তার সামাজিক বা ব্যবহারিক অবয়ব আসলে বিষয়গত। যা দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।[৭৩]

---

[৬৯].শুকরি আজিজি আল মাদি, *ফি নাজরিয়াতি আল আদব*, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩

[৭০]. মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, রোমান্টিসিজম, পৃ. ১৩

[৭১].প্রাগুক্ত পৃ. ১৪

[৭২]. মিখাইল নু'আইমা, আল গিরবাল, পৃ. ৭০

[৭৩]. শুকরি আজিজি আল মাদি, ফি নাজরিয়াতি আল আদাব, পৃ. ৬৭

চতুর্থত :

কাব্যিক সুরের প্রয়োজনীয়তা ঃ

সাহিত্যে অনেক সময় সুর ও সঙ্গীতের প্রয়োজন হয়। কারণ প্রকৃতির মধ্যে শব্দ ও সুরের একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য বিরাজমান। আমরা শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারি না, যখন বজ্রপাতের প্রচন্ড শব্দ হয় সেই শব্দ জল বা গাছের পাতায় স্পন্দিত হয় তখন শব্দ সংকুচিত হয়ে একটা মৃদু বা শিথিল শব্দের ঝংকার তৈরি হয়।[৭৪]

বিভিন্ন ও বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে শব্দ তৈরি হয়। আর বিভিন্ন শব্দ থেকে সৃষ্টি হয় নানা সুরের। নু'আইমা যে বজ্রধ্বনি থেকে জলে ও পাতার শব্দের কম্পনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে মূলত প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতাই প্রকাশ করেছেন, যা কিনা রোমান্টিক রচনা নির্মাতাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। পাথরের শব্দ বা যেকোনো শব্দ প্রকৃতির মাধ্যমে নানা শব্দ ও সুরের তৈরি করে। তেমনিভাবে কাব্যেও নানা শব্দ, সুর ও ছন্দের প্রয়োজন। বক্তৃতা, সঙ্গীত সৌন্দর্যের সবচেয়ে শক্তিশালি উপাদান। কারণ এটি আত্মাকে উন্নত করার, যা প্রকাশ করা যায় না তা প্রকাশ করার সবচেয়ে বড় উপায়।[৭৫]

নু'আইমা'র মতে, সাহিত্যের মনস্থির হয় আর সাহিত্যের মূল্য স্থির হয় প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। নু'আইমা বলেছেন, এগুলো হল নির্দিষ্ট মান যার দ্বারা আমাদের সাহিত্যেকে পরিমাপ করা হয় এবং এর প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করে।[৭৬]

নু'আইমা সাহিত্যের চারটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো আবেগ, সৌন্দর্য, সত্য ও সঙ্গীত এ চারটি ধারারই গদ্যে ও পদ্যে আলাদা আলাদা অবস্থান রয়েছে। যদিও তিনি এর অবস্থান ততটা ব্যাখ্যা করেননি কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা বর্ননা করেছেন।

---

৭৪. মিখাইল নুআইমা, *আল গিরবাল*, পৃ. ৭১

৭৫. মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, *আন নাক্‌দ আল আদাব আল হাদীস* (বৈরুত : দার আস সাকাফা ওয়া দার আল আওদাহ, ১৯৭৩ খ্রি.) পৃ. ৩০৬

৭৬. . মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল*, পৃ. ৭১

আল গিরবালের বার্তা ছিল শক্তিশালী ও স্পষ্ট। এই বইটির পুনর্মূল্যায়নে সবাই বলেছেন, *আল গিরবাল* বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দলিল হিসেবে রয়ে গেছে। যদিও তার সাহিত্য সমালোচনার ধারা সেসময় অনেক সমালোচিত হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তার এই সমালোচনার বইটি আজকের দিনেও ততটা প্রাসঙ্গিক যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল সেসময়ে।[৭৭] এই বইটিতে সাহিত্য সমালোচনার সাথে সাথে সাহিত্য বিষয়ক যে জ্ঞান রয়েছে তা অনেক সাহিত্যিককে জ্ঞানের আলো দেখাবে, সঠিক পথ প্রদর্শন করবে।

গিরবাল বইটি বর্তমান সাহিত্যে এতোটাই প্রাসঙ্গিক যে, এসম্পর্কে Hashem Salek বলেছেন, “আল গিরবাল বইয়ের কি বয়স হয়েছে? এটা কি তার প্রভাব হারিয়েছে? এটা কি অপ্রচলিত হয়ে গেল? হ্যাঁ, এর কিছুটা দিক হতে পারে কিন্তু এর সারমর্ম বা চিন্তা চেতনায় নয়। বইট এখনও জীবন্ত, সমসাময়িক বইয়ের মতোই। এটি এখনও আমাদের বর্তমান বাস্তবতার সাথে প্রাসঙ্গিক। যখন আমরা এই বইটি পড়ি, তখন আমরা অনুভব করি মিখাইল নু'আইমা এখনও আমাদের সাথে আছেন।”[৭৮]

এটি একটি আরবী প্রগতিশীল, অগ্রগামী বুদ্ধিজীবি হিসেবে তার গঠনমূলক লেখার শক্তিশালী প্রমাণ।

---

[৭৭] https://www.amazon.com/Mikhail-Naimy-al-Ghirbal-Selections-Introduction/dp/1090240597

[৭৮] প্রাগুক্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিখাইল নু'আইমা'র কাব্যদর্শন

সাহিত্যের অতি প্রাচীন আবার কখনোবা বলা হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হচ্ছে কবিতা। ধারণা করা হয়, যখন মানুষ পড়তে ও লিখতে জানতো না বা অক্ষরজ্ঞান ছিলো না তখনও মানুষের মুখে মুখে বিভিন্ন ছন্দ বা কবিতার প্রচলন ছিলো। মানুষ যখনই তার মনের ভাব কিছু শব্দও ছন্দাকারে কাব্যিক সুরে প্রকাশ করে তখনই হয় সেটা কবিতা। বলা হয়ে থাকে প্রত্যেকটি মানুষের সত্তায়ই একজন কবি বাস করে। যুগে যুগে কবি, কবিতার সংজ্ঞা প্রকারভেদ কাব্যিক আলোচনায় অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে এবং ঘটবে।

১.কবিতা কী ও কার্যকারিতা :

কবিতা হলো আরবদের দিওয়ান বা তথ্যভাণ্ডার। তারা অন্তমিল ও ছন্দের মাধ্যমে গদ্য ও পদ্যের মাঝে পার্থক্য করে।

* আল জাহিযের মতে কবিতা হলো– আরবরা তাদের অজ্ঞতার সময়ে বা জাহেলী যুগে অন্তমিলযুক্ত কবিতা ও ছন্দযুক্ত বক্তৃতাকে তাদের অমরত্ব লাভের উপায় মনে করতো। আর এই কবিতাই ছিলো তাদের দিওয়ান বা তথ্যভাণ্ডার।[৭৭]

*ইবনে তাবাতাবা বলেছেন, মানুষ তার কথোপকথনে ব্যবহার করে এমন বিক্ষিপ্ত শব্দ যা সংগঠিত, স্পষ্ট, বক্তৃতা থেকে ভিন্ন, যা মানুষ শুনতে চায় সেটাই কবিতা।[৭৮]

*ইবনে কুদামাহ কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, কবিতা হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ ছন্দযুক্ত উক্তি, যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে।[৭৯]

---

৭৭. আল-জাহিয আবু উসমান আমর বিন বাহর, *কিতাব আল হায়ওয়ান*, সম্পাদনা: আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, ২য় সংস্করণ, (লেবানন: দারুল জীল, ১৯৬৫ খ্রি.) প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৬

৭৮. মুহাম্মদ আহমদ ইবনে তাবা তাবা আল আলী, *ইয়ারু আশ-শে'র*, সম্পাদনা :আব্বাস আবদেল সাত্তার (বৈরুত: দার আল কুতুব ইসলামিয়া ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৯০

৭৯. আবুল ফারজ কুদামা ইবন্ জাফর, নাক্দ আশ্- শের, সম্পাদনা: কামাল মুস্তাফা, (কায়রো: আল-খানজি লাইব্রেরি, বাগদাদ: আল মুথান্না লাইব্রেরি, ১৯৬৩ খ্রি.) পৃ-১৫

* আবুল আলা আল মা'আরি কবিতা বলতে বুঝান, যেখানে প্রবৃত্তির গ্রহণযোগ্যতা ও ইন্দ্রিয়ের স্বচ্ছতা অন্তমিলের সাথে সংযুক্ত থাকবে। অর্থ্যাৎ অন্তমিলযুক্ত কথা, যেখানে কম বা বেশি ইন্দ্রিয় ও সহানুভূতি দিয়ে মানুষের ভাব প্রকাশ করা হয়।[৮০]

* সাহিত্যের সুর কবিতা। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় যে সকল পদ্য লেখা হয় তাকে বলে কবিতা।[৮১]

*কবিতা কাব্য বা পদ্য হচ্ছে শব্দ প্রয়োগের ছান্দসিক কিংবা অনিবার্য ভাবার্থের বাক্য বিন্যাস, যা একজন কবির আবেগ অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তা করার সংক্ষিপ্ত রূপ এবং তা আবশ্যকীয় ভাবে উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ।[৮২]

*গ্রিক কবি দার্শনিক অ্যারিস্টটল কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, কবিতা দর্শনের চেয়ে বেশি, ইতিহাসের চেয়ে বড়। এখানে তিনি কবিতার মাধ্যমে মানুষের সুগভীর ভাবনার প্রকাশ ও বিশালতার কথা বলেছেন।[৮৩]

* ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ফরাসি কবি শেলি কবিতার সংজ্ঞায় বলেছেন, কবিতা পরিতৃপ্তির বিষয়। কবিতা তখনই সার্থক হয় যখন কবি মনের পরিতৃপ্তিতে পূর্ণতা আসে।[৮৪]

* কবি সৈয়দ শামসুল হকের মতে, কবিতা হচ্ছে সর্বোত্তম ভাবের সর্বোত্তম শব্দের সর্বোত্তম প্রকাশ। সর্বোত্তম ভাবের সঙ্গে সর্বোত্তম শব্দের সংযোগই পারে সর্বোত্তম কবিতা সৃষ্টি করাতে।৮৫

*কবি রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, যে লেখাটি সমকালের স্মৃতি বা স্বপ্নকে তুলে আনতে সক্ষম এবং একই সঙ্গে সমকালকে অতিক্রমের যোগ্যতা রাখে, তাকেই বোধ হয় কবিতা বলা যেতে পারে।[৮৬]

---

৮০. আবুল আলা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান আল মাআররী, *রিসালাতুল গুফরান*, ,সম্পাদনা: কামিল কিলানী, (কায়রো হিন্দভী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ৫৪

৮১.https://www.swapybooks.com/author/masum/

৮২. https://bn.wikipedia.org/wiki/ কবিতা

৮৩. https://nagorik.prothomalo.com/durporobash/ কবিদের-ভাবনায়-কবিতার-সংজ্ঞা

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. প্রাগুক্ত

৮৬.প্রাগুক্ত

মূলত কবিতা হচ্ছে কবি মনের ভাব প্রকাশ যা সুনির্দিষ্ট ও সুশৃংখল আকারে প্রকাশ পায়। প্রকৃত পক্ষে কবিতাকে সঠিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা বা নির্দিষ্ট ফ্রেমে তুলে ধার কঠিন। শুধু ছন্দযুক্ত বা অন্তমিলযুক্ত হলেই যেমন তাকে কবিতা বলা যায় না আবার ছন্দহীন হলেই যে সেটা কবিতা না তাও বলা অসম্ভব। মূলত কবিতা হলো কবি মনের যুক্তিহীন ভাব প্রকাশ।

যেহেতু কবিরা তাদের কবিতার একটি লাইন দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করার আশা করেন তাই এই কবিতা লেখক ও সমালোচকদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কবিতার সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল জাহিজ আবু- হিলাল, আল-আসকারি, আস সা'আলাবি, ইবনে রাশিক আল-কায়রাওয়ানি প্রমুখ অন্যতম।

কবিতার ব্যাপারে মিখাইল নু'আইমা'র মূল্যায়ন

আরবী সাহিত্যে প্রাচীন সমালোচকরা ছন্দ, ছড়া, সুর, শব্দ, অন্তমিল ও অর্থের বিবেচনায় কবিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। প্রাচীন যুগে সাহিত্যকর্মের ব্যহ্যিকরূপ, অর্থ ও আরবি কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচনা হতো।

আধুনিক যুগে আরব রোমান্টিক সমালোচকরা কবিতার সারাংশের দিক মনোযোগ দেন, কবিতার বাহ্যিক রূপের দিকে নয়। যেমন আব্বাস মাহমুদ আল আল আক্কাদ বিখ্যাত কবি আহমদ শাওকিকে বলেন, জেনে নিন হে মহান কবি, বিখ্যাত কবিরা কবিতার সারর্মম নিয়ে চিন্তা করেন, কবিতার বাহ্যিকরূপ তথা আকার বা আকৃতি নিয়ে চিন্তা করে না।[৮৭]

নু'আইমা তার "গিরবাল" গ্রন্থে প্রাচীন লেখকদের আরবী কবিতা বুঝার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে কেউ কেউ কবিতা বলতে ছন্দযুক্ত নির্দিষ্ট কথামালাকে বুঝিয়েছেন। আবার অন্যরা এর অর্থ অনুধাবন করতে না পারলে সেটাকে কবিতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে চাননি। তিনি বলেছেন, কবিতা মানে হলো ছন্দুযুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ কথামালা এমনটি হলেই তাকে কবিতা বলা যায়। আর পাঠক যদি অভিধানের মাধ্যমে তার অর্থই না বুঝতে পারে তাহলে সেটকো কবিতা হিসেবে মূল্যায়িত করা যায় না।[৮৮]

আরব লেখকদের মধ্যে কবিতা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ছিল যা নু'আইমাকে বিভ্রান্ত করেছে। তিনি সেসময় প্রকৃত কবিতা ও সাহিত্য জগতে এর মর্যাদা সম্পর্কে প্রাচীন লেখকদের অজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি প্রকৃত কবিতা ও সাথে সাথে কবিতার সৃজনশীলতা ও বিকাশের দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কবিতা সম্পর্কে তার দুটি মতবাদ রয়েছে। তাদের মধ্যে একদল মনে করে যে, কবিতা হলো কিছু শব্দগুচ্ছ, ছড়া ও অন্তমিলের সমন্বয়ে গঠিত কিছু শব্দমালা। আর অন্যদল কবিতাকে একটি প্রাণশক্তি একটি সৃজনশীল শক্তি হিসেবে দেখে যা সর্বদা এগিয়ে যাচ্ছে।[৮৯] তার কবিতা এই দুটি অংশকে একত্রিত করে। তার কবিতা

---

[৮৭] .আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, এবং আল মাজিনি ইব্রাহিম আবদুল কাদের, *আদ দিওয়ান ফি আল আদাব ওয়ান নাক্‌দ*, (কায়রো: হেন্দাভী ফাউন্ডেশন, ২০১৭খ্রি.) পৃ. ২৩

[৮৮] . মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল* ,পৃ ৭৫

[৮৯] . প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬

ছিলো বৈচিত্র্যময়, নবায়নযোগ্য, প্রাকৃতিক সংগীতের প্রকাশ, চিরন্তন সৌন্দর্যের আবাস যেখানে মানুষের আত্মার অভ্যন্তরীণ আবেগকে প্রকাশ করে। এবং সাথে সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা প্রকাশ করে। তিনি বলেছেন কবিতার বাস্তবতা নিয়ে এছাড়া প্রথম বা দ্বিতীয় কোনো বিষয় নয় বরং এটাই মূলকথা।

কবিতা হলো অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়, মিথ্যার উপর সত্যের জয়। এটি বেঁচে থাকার জন্য একটি স্থায়ী সৌন্দর্য। কবিতা হলো জীবনকে উপভোগ করার আনন্দ, কবিতা হলো নিজের স্বদেশে ফিরে যাবার মতো আনন্দ। এটি একটি চিরন্তন আকর্ষণ। যেখানে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব, গাছপালা, জড় পদার্থ প্রাণী সবকিছু। কবিতা হলো আধ্যাত্মিক আত্মার প্রসারিত প্রান্ত যা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত স্পর্শ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, কবিতা মানুষকে হাসায়, মানুষকে কাঁদায়, কথা বলায়, ভ্রমণের সঙ্গী হয়, সমস্যার সমাধান করে এমনকি অমরত্বের সন্ধান দেয়।[৯০]

ইমরুল কায়েস, আনতারা, মুহাল্লাল, আল-আমিরির মতো কবিদের কবিতা কখনো আমাদের আবেগকে নাড়া দেয়, কখনো আমাদের আনন্দিত করে আবার কখনোবা আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে। কবিতা আমাদের চিন্তা, আমাদের হৃদয়কে অবস্থা, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকাশ করে।

কবিতাকে আমরা বক্তৃতা বলতে পারি না। এটা আমাদের মনে খোদাই করা ছবি, যার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমরা পছন্দ করি। কবিতায় উচ্চারণের সুর, গঠনের মসৃণতা ও প্রকাশের বাগ্মীতা আমাদেরকে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই আমরা আনন্দিত হই আমরা বারবার পড়ি। আমাদের আত্মার স্বভাবজাত হিসেবে আমরা পড়ি। আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের আবেগ প্রকাশের ভাষা হিসেবে আমরা কবিতা পাঠ করি।[৯১]

নু'আইমা'র কাছে কবিতা কোনো ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য বা কথাসাহিত্য নয়। এটি জীবনের বাস্তবতা পরিবর্তন কওে না কবির দ্বারা মানুষের মানবিক গুণাবলী তৈরি হয় না। বরং তিনি মানুষের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক তৈরি করেন যা দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়।

৯০.প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬-৭৭
৯১.প্রাগুক্ত পৃ. ৭৮-৭৯

সম্পর্ক তৈরি করা কবির মনগড়া বিষয়। যাকে আমরা কল্পনা হিসেবে অভিহিত করি। কিন্তু কবির কল্পনাই বাস্তব। একজন প্রকৃত কবি আধ্যাত্মিক চোখে যা দেখেন তা ছাড়া কিছুই বলেন না বা লেখেন না। তিনি তার কল্পনার চোখ দিয়ে সে বিষয়কে বাস্তবে দেখতে পান। যদিও কখনও কখনও সেটা বাস্তব চোখ দেখতে পায়না।[৯২] মানুষের চিন্তাভাবনা, আবেগ যদি সুন্দরভাবে সুন্দর সুরে উচ্চারিত হয় তাহলেই সেটা হয় কবিতা। কবিতা হলো আত্মার ভাষা। আর কবি হলেন সেই আত্মার ভাষার অনুবাদক।[৯৩]

নু'আইমা কবিতায় প্রাচীন কবি ও লেখকদের কিছু মতামত নিয়েছিলেন। কারণ তিনি কবিতায় প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সাথে ভারাসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছেন যা কবিতাকে দেয় সৃজনশীলতা, বিকাশ, অমরত্ব, আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, কল্পনা, সত্য ও আবেগের সন্ধান। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আধুনিক যুগে রোমান্টিক কবিদের কতিায় পাওয়া যায়। হেলাল বলেন : আবেগ, ছন্দ ও অন্তমিল কবিতাকে গল্প থেকে আলাদা করে না। কবিতায় আবেগ বা চেতনা যদি হারিয়ে যায় সেগুলো গদ্যের কিছু অনুচ্ছেদেও পাওয়া যেতে পারে। আর সেখান থেকেই গঠিত হতে পারে নতুন কোনো কবিতা রচনার উপাদান।[৯৪]

রোমান্টিক সাহিত্য আবেগ, কল্পনা, মুক্তির সাহিত্য। এই সাহিত্য বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রস্থান ও স্বাধীনতার চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে।[৯৫]

সাহিত্যের বিভিন্ন দিক তত্ত্ব ও সাহিত্য দর্শন সম্পর্কে পশ্চিমাদের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে। কবিতার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মানবিক আবেগ, অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করে কবির ভাষায় সেটা প্রকাশ করা।

---

[৯২] ৯২. প্রাগুক্ত পৃ. ৮২-৮৩

[৯৩] ৯৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১১৫

[৯৪] ৯৪. মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, *আন নাক্দ আল আদাব আল-হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

[৯৫] ৯৫. ইসমাঈল ইজ আল দ্বীন, *আল আদাব ওয়াল ফুনুন: দিরাসাতুন নাক্দ*, অষ্টম সংস্করন (কায়রো: দারুল যিকর আল আরাবী, ২০১৩খ্রী.) পৃ, ৩০

আরবরা তাদের সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনা ও কবিতার কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের তেমন কোনো অনুসরণ করেননি। তবে তাদের কবিতা ঐতিহাসিক সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রাক ইসলামী যুগে কবিতা ছিলো আরবদের প্রধান জ্ঞানের হাতিয়ার। কবিতার মাধ্যমে তারা অনেকসময় তাদের শাসনব্যবস্থার বিষয় ও অনেক কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতেন।[৯৬] যখন ইসলামী যুগ আসে তখন কবিতার অবস্থান শক্তিশালী হয়। কবিতার মাধ্যমে তখন ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করার কথা বলা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বিন সাবিতকে বলেছিলেনঃ তাদের সাথে কথা বলো অর্থাৎ কুরাইশদের সাথে। কারণ খোদার কসম তোমার কাব্য তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, অন্ধকারের গরম হাওয়া, ক্রোধের চেয়ে শক্তিশালী। আর তোমার সাথে আছে পবিত্র আত্মা জীবরাঈল (আ)।[৯৭]

আরবদের জন্য কবিতা এমন একটি বিষয় ছিলো যা তাদের জীবনকে চিত্রিত করে। আরবদের জীবন-জীবিকা, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, "কবিতা এমন লোকদের জ্ঞান ছিলো যাদের জ্ঞানের ব্যাপারে সঠিক বুঝ ছিল না।"[৯৮]

ইবনে আব্বাস মহান কুরআনের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যদি আপনি পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পড়েন, আর আপনি তার ব্যাখ্যা না বুঝতে পারেন, তবে আরবদের কবিতা অনুসন্ধান করুন। কারণ কবিতা হলো আরবদের দেওয়ান। যদি কুরআন থেকে কিছু জানতে চাওয়া হয় তবে তা কবিতায় অনুসন্ধান করতে হবে।[৯৯]

---

৯৬. মুহাম্মদ বিন সালাম আল জুমাহি, *তাবাকাত ফাহুল আল শুআরা* (বৈরুতঃ দার আল কুতুব আল ইসলামিয়া, ২২০১খ্রী.) পৃ ২৪

৯৭.আবু আলী আল- হাসান ইবনে রাশিক আল কিরওয়ানি, *আল উমাদা ফী সানাআতি শের ওয়ান নাক্‌দাহ*, খন্ড -১, পৃ-২৯

৯৮. মুহাম্মদ বিন সালাম আল জামাহী, *তাবাকাত ফাহুল আল শুআরা* ,প্রাগুক্ত, পৃ ২৪

৯৯. আবু আলী আল- হাসান ইবনে রাশিক আল কিরওয়ানি, *আল উমাদা ফী সানাআতি শের ওয়ান নাক্‌দাহ*, খন্ড -১, পৃ-৯০-৯১

উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের সন্তানদেরকে অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দানের সাথে সাথে শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে কবিতাও শিক্ষা দেওয়া হতো।[১০০]

প্রাক-ইসলামিক যুগে কবিতা শুধুমাত্র নিজের সুবিধার্থেই রচনা করতো না বরং বিভিন্ন মজলিসে, বিভিন্ন প্রয়োজনেও তারা কবিতা রচনা করতো। ইসলামী যুগে নবী করীম (সা) ও কথা বা বক্তৃতার জাদু কিভাবে আত্মাকে প্রভবিত করে সে বিষয়ে জানতেন। এবং এর গুরুত্বের প্রশংসা করে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই বক্তৃতায় যাদু রয়েছে।[১০১]

ইসলামী যুগে রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতার সাথে সাথে উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের সময়ে কবিতা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। যেখানে কবিতা আবৃত্তি ও সাহিত্যের মূল্যায়ন হতো। এবং সেসময় এমন অবস্থা ছিলো যে, সাহিত্যিকদের সমাবেশ বা ভদ্রলোকদের সমাবেশগুলোতে কবিতা আবৃত্তি ছাড়া তৃপ্তি পেতো না।[১০২]

নু'আইমা'র মতে কবিতার কাজটি কেবল সামাজিক নয়। বরং কবি তার কবিতার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের চিত্র তুলে ধরেন, মানুষের চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলেন এবং বর্তমান সময়কে বর্ণনা করেন। কারণ কবি জীবন থেকেই কবিতা রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন যে, কবিকে তার সময়ের দাস হওয়া উচিত নয়, কবিকে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কবিতা রচনা করবে না। মানুষ যেভাবে বলবে, যা শুনতে চাইবে সেভাবে কবিতা রচনা করা ঠিক নয়। কবি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কবিতা রচনা করবেন। তার কবিতায় জীবনের রশ্মি প্রতিফলিত করবেন। জীবন থেকে কবিতার রসদ সংগ্রহ করবেন। তাই বলা হয়, "কবি তার সময়ের সন্তান"।[১০৩]

---

১০০. আল রাফিই, মুস্তফা সাদিক, *তারিখ আদাব আল আরব*, (কায়রো: হিন্দাভী ফাউন্ডেশন,২০১৩খ্রী), ১ম খন্ড,পৃ-৩৪
১০১. উদ্ধৃত, ইবনে তাবাতাবা, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে অহমদ, ইয়ার আশ- শের, পৃ-২১
১০২.আবু হিলাল আল হাসান বিন আবদুল্লাহ ইবনে সাহেল আল আসকারি, *আসসানাআতাইন : আল কিতাবাহ ও শির* ,পৃ-১৩৮
১০৩. মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল* , প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪

যারা কবিতাকে অবনমিত করার এবং কবিতার কর্তৃত্বকে সীমিত করার চেষ্টা করেছিল তাদের সামনে নু'আইমা কবিতার মর্যাদা রক্ষায় কাজ করেছেন। কবিতার নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা করেছেন। জীবনের উপর কবিতার প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, কবিতায় অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আধ্যাত্মিক চাহিদাও থাকবে। কারণ এটি সত্য, ন্যায়, সৌন্দর্য ও মঙ্গলের জন্য রচিত স্বপ্ন। সাধারণ মানুষের চোখ এটি দেখতে পায়না, কান চারপাশের পৃথিবীর ছোটো ছোটো উদ্বেগ ও বড় বড় সমস্যাগুলো শুনতে পায় না।[১০৪]

নু'আইমা কবিতার মাধ্যমে বিনোদনমূলক, সামাজিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক কাজগুলোকে একত্রিত করেছেন। অর্থ্যাৎ একইসাথে এর উপকারিতা ও আনন্দকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নু'আইমা'র মতানুসারে কবিতার মানের উৎস হবে সাহিত্যিক মান এবং কবিতার কাজ রোমান্টিকদের দ্বারা সম্পাদিত হবে। কারণ রোমান্টিকদের কাজ হলো কবিতার আধ্যাত্মিক, মানবিক ও সামাজিক বিষয়গুলো মানুষের সমানে এমনভাবে বর্ণনা করা যাতে মানুষ তার স্রষ্টার দিকে উন্নীত হয়। মানুষ ও সমাজের জন্য যা আদর্শ হয়।[১০৫] কবিদের একটি মানবিক বার্তা রয়েছে। কারণ কবিরা কবিতার মাধ্যমে মানুষের মানবিক আবেগ বর্ণনা করেন এবং মানুষের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন।

---

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০

১০৫. মুহাম্মদ হিলাল গুনাইমি, রোমান্টিসিজম, পৃ.১৭৮, Standard of Michael Nuaima's Poetry Criticism in his Book (Al-Girbal): A critical Study, করেন জার্নাল অফ লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড লিটারারি স্টাডিজ , পৃ ১৭।

২. কবিতার ভাষা :

ভাষা হল চিন্ত ও আবেগ প্রকাশের একটি হাতিয়ার। আর সাহিত্যের ভাষা হলো ইঙ্গিতপূর্ণ ও রূপক ভাষা। কারণ সাহিত্যের ভাষায় লক্ষ্য হলো মানুষকে প্রভাবিত করা। কবিতার মাধ্যমে কবি তার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কাব্যিকভাবে তার চিন্তার শব্দগুলোকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। কবির ভাষা কবিতার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়। কবিতার ভাষা, সুর মানুষের আত্মাকে মোহিত করে। কাব্যিক ভাষার অভিব্যক্তির অন্যতম উপাদান হলো আবেগ, ভাষা, কল্পনা, সুর।[১০৬]

মুস্তফা মানদুর ভাষার প্রকৃতি ও কবিতার সাথে এর সংযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখ করে বলেন, সম্ভবত ভাষার কাব্যিক ব্যবহার তার প্রকৃতির সবচেয়ে নিকটতম। আমি কবিতাকে কেবল এক ধরণের সংগীত বা ছন্দ হিসেবে দেখি না বরং এটি একটি ভাষাগত সৃষ্টি।[১০৭]

হিলালের মতে, “কবিতার ভাষা এবং কবিতার শব্দ ইঙ্গিতমূলক চিত্র প্রকাশ করে। কবি এই চিত্রগুলোকে সহজাত রূপক অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।”[১০৮]

নু'আইমা'র মতে ভাষা জীবনের একটি বহিঃপ্রকাশ। ভাষা জীবনের নিয়মের পক্ষে চলে কারণ জীবনের প্রয়োজনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তন হয়। এইভাবেই বিভিন্ন ভাষা বেঁচে থাকে বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্যাবিলনীয় এবং অ্যাসিরিয়ানদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।[১০৯]

---

১০৬. আস-সাঈদ আল বায়ুমি, *লুগাতির শির আল আরাবি আল হাদিস*, ২য় সংস্করন (কায়রো: দার আল মাআরিফ, ১৯৮৩ খৃ.) পৃ ৭৬,৭০

১০৭. মুস্তফা মান্দুর, *আল লুগাহ ওয়াল হাদারাহ্স*(কায়রো: মানশায়াত আল মারেফ, ১৯৭৪খৃ) পৃ ৮৯

১০৮.মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, *আন নাক্দ আল আদাব আল হাদীস*, (বৈরুতঃ দার আস সাকাফা ওয়া দার আল আওদাহ, ১৯৭৩ খ্রি.) পৃ. ৩৮৭,৩৮৮

১০৯. মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল* , প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩

মিখাইল নু'আইমা ও অন্যান প্রবাসী লেখকদের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, ভাষার ব্যাপারে তাদের আহ্বান ছিলো তাত্ত্বিক, তারা তাদের লেখায় ধ্রুপদী ভাষা ব্যবহার করেননি। তাদের ভাষা ছিলো সহজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তাদের লেখার ভাষা ছিলো নমনীয়, ব্যবহৃত ও মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষা। এতে তিনি মান্দুবের সাথে একমত ছিলেন যে, প্রবাসী লেখকরা ভাষার মান থেকে বিচ্যুত হয়নি, নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। এবং নাটকের ব্যতিক্রম ভাষা ছাড়া নু'আইমা'র লেখার ভাষাও ছিলো তাত্ত্বিক। নাটকের সংলাপে নু'আইমা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুসারে ভাষার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[১১০]

নু'আইমা বলেন, আমি সবচেয়ে বড় বাঁধার সম্মুখীন হয়েছি(পিতা ও পুত্র) নাটকে স্থানীয় ভাষা ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের কারণে। যেখানে আমি এমন ভাষা ব্যবহার করেছি, যে ভাষায় লোকেরা তাদের অনুভূতি ও চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত।[১১১]

স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার শুধুমাত্র প্রবাসী লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা। বরং অনেক পশ্চিমা লেখকদের মধ্যেও এর ব্যবহার ছিলো। যেমন: উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth) এর দৃষ্টিতে যে অনুভূতি প্রকাশে স্বাভাবিক ভাষা উপযুক্ত নয় বরং নিম্ন শ্রেণির মানুষের ভাষায় পাওয়া যায় বা প্রামাঞ্চলের মানুষের ভাষায় পাওয়া যায় তেমন ভাষাই ব্যবহার করা উচিত। এবং তিনি তথাকথিত কাব্যিক অভিব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন কবিতার ভাষা এবং গদ্যের ভাষার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়।[১১২]

পশ্চিমা লেখকদের মধ্যে কাসিম আমিনের একটি নিবন্ধ রয়েছে মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল তাই বইতে (ثورة الادب) উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি ভাষা ব্যবহারে শর্তাবলীতে নতুন নতুন শব্দের ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে বলেছেনঃ কবিতার অপ্রচলিত ও নতুন শব্দ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।[১১৩]

১১০.মুস্তফা মান্দুর, *আন নাকদ ওয়ান নাকদ্ আল মুআসসিরিন*,পৃ ৩৬
১১১. মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল* , প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩-৩৪
১১২. শুকরি আজিজি আল মাদি, ফী নাজরিয়াত আল আল আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫
১১৩. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল, *সুরাতিল আদাব* (কায়রো: হিন্দাভী ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন এন্ড কালচার ২০১২ খৃ) পৃ ৩৭

আহমেদ আমিনের মতে, শব্দের নতুনত্ব দুই ধরণের হতে পারে। প্রথম প্রকার এমন শব্দ চয়ন করা যা সময়ের সাথে উপযোগী। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন শব্দ নেয়া যা বর্তমান প্রজন্মের রুচির সাথে মানানসই। এটি শিল্প, বিজ্ঞান বা বিভিন্ন মতামত থেকে উদ্ভাবিত হতে পারে।[১১৪]

আহমদ আমিন ব্যাখ্যায় আরো বলেছেন, অনেক আঞ্চলিক ভাষা এবং অভিব্যক্তি তাদের শক্তিশালী ব্যবহারের কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ যদি সেগুলো আরবীতে প্রকাশ করে তবে সেটার জন্য ভালো অর্থ পাওয়া যাবে না। আরবী সাহিত্যের জন্য বরং কথোপকথনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য শব্দের প্রয়োজন। তবে যখন ভাষা জাতির নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, প্রাচ্যের জনগণের বন্ধন রক্ষা করে, তখন ভাষা জীবিত হয়। আরবী ভাষা তার স্থান ও ব্যবহারের প্রেক্ষিতে একটি জীবিত ভাষা।[১১৫]

যাই হোক আল আক্কাদ, কবিতা ও গদ্য রচনায় ভাষায় অখণ্ডতা ও শুদ্ধতার কথা জেনেও ভাষার বিকাশের জন্য সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষে মত দিয়েছেন। এটি একটি বিশেষ গুণ।[১১৬]

প্রাচ্যের সমালোচকদের মধ্যে যারা প্রবাসীদের ভাষাকে রক্ষা করেন তাদের ব্যাকরণগত ও রূপগত ত্রুটি তারা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তাদের ভাষাকে উদ্ভাবন ও প্রকাশের ক্ষমতার কথাও বর্ণনা করেন। সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করেন যে বিখ্যাত লেখক ও কবিদের মধ্যেও এ ভাষা ব্যবহারের প্রতিকূলতা রয়েছে। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ মান্দুর বলেছেন, আমরা প্রবাসী লেখকদের মধ্যে আরবী ভাষার দুর্বলতা অনুসন্ধান করছিলাম। কিন্তু এটা এমন একটা অভিযোগ যাথেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। কারণ আমি যত বেশি তাদের শব্দ ও বাক্য কাঠামোর দিকে তাকাই সেখানে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাই না। তাদের কবিতায় সংবেদন জাগানোর ক্ষমতা আধুনিক কবিতার মতোই।

---

[১১৪] আহমদ আমিন, *আত্ তাজদিদী ফিল আদাব* (আল রেসালা ম্যাগাজিন, ভলিউম ৬, ১ এপ্রিল, ১৯৩৩খৃ.) পৃ ১২,১৩

[১১৫] প্রাগুক্ত, ভলিউম ৮, ১৫ এপ্রিল, ১৯৩৩খৃ. পৃ ৬,৭

[১১৬] মুহাম্মদ মোস্তফা হাদারা, আত্ তাজদিদী ফি শির আল মাহজার, ১ম সংস্করণ (বৈরুত:দার আল যিকর আল আরাবি, ১৯৫৭ খৃ.) পৃ -৭৪

হ্যাঁ, তারা ব্যাকরণ বা শব্দের রূপতত্ত্বে ভুল করতে পারে। কিন্তু আমার মতে এগুলো বিরল জিনিস যা বিখ্যাত লেখকদের মধ্যেও অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দশৈলীর ত্রুটি তাদের কবিতায় নেই।[১১৭]

মান্‌দুর বিশ্বাস করেন যে, প্রবাসী লেখকরা কবিতার ভাষাকে মহিমান্বিত করেছে। এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে এসেছে, যা তাদের আবেগ, অনুভূতিকে প্রকাশ করে। তিনি দেখেন যে তাদের কাব্যিক অভিধানে প্রতিদিনের ব্যবহৃত ও পরিচিত শব্দ গুলো রয়েছে। কারণ শব্দগুলো কবির অনুভূতিকে প্রকাশ করে। আমরা আমাদের জীবনে যে শব্দগুলো ব্যবহার করি সহজে অর্থ বোঝানোর জন্য সে শব্দগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে।[১১৮]

মুহাম্মদ আবদ্‌ আল গনি হাসান তাদের ভাষাগত বৈচিত্রের সমর্থন করেছিলেন এবং এর পক্ষে তিনি একটি কারণ খুজেঁ পেয়েছিলেন যে, তাদের স্বাধীনতার প্রবণতা এবং ভাষার ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি নিষেধকে পরিহার করে ভাষার ব্যবহারে সহনশীলতা।[১১৯]

সালমা আল খাদরা আল জায়ুসি কবিতার ভাষা সাধারণ ও সহজ করতে অস্বীকার করেন। কথ্য ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে তার অস্বীকৃতির কারণ হলো আরব বিশ্বের অনেক লেখক তার নেতিবাচক সমালোচনা করেছে। এটি সাধারণভাবে প্রবাসী কবিদের উপর দায়িত্বহীনভাবে প্রচারিত একটি সমালোচনা।[১২০]

---

১১৭. মুহাম্মদ মান্দুর, *ফি আল মিযান আল জাদিদ*, ভলিউম ১,(তিউনিশিয়াঃ কোতাইব প্রেস, ১৯৮৮ খৃ.) পৃ. ৮৬
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬
১১৯. Standard of Michael Nuaima’s Poetry Criticism in his Book (Al-Girbal): A critical Study, Journal of Linguistics and Literary Studies, The second issue, Twelfth year, p-178
১২০. সালমা আল খাদরা আল জায়ুসি, *আল ইজতিহাদি ওয়াল হারাকাতি ফি শের আল আরাবী আল হাদিস*, অনুবাদঃ আবদুল ওয়াহেদ লুলু’আ,২য় সংস্করণ, (বৈরুতঃ আরব ইউনিট স্টাডিজ কেন্দ্র, , ২০০৭খৃ) পৃ.১৪১

প্রবাসী কবিরা বিশ্বাস করেন যে, ভাষা একটি মাধ্যম কিন্তু এটাই শেষ উপায় নয়। বরং শেষ উপায় হলো এর অর্থ ও চিন্তা বা ধারণা। তাদের দৃষ্টিতে শব্দটি বোঝার জন্য তার অর্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং ধারণাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের ভাষা যদি কবির ধারণা প্রকাশ করতে পারে তবে সেটাই হবে যথার্থ ভাষা। যখন ধারণা শক্তিশালী হয় তখন অর্থও ঠিক হয়। যখন তুর্কি যুগে তারা অর্থের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল তখন সাহিত্যকে মৌখিক শিল্পের বিধিনিষেধ দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো, শব্দের স্থবিরতা সাহিত্যকে আরো দুর্বল করে দিয়েছিলো। তারা শব্দের উচ্চারণের চেয়ে অর্থকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল।

মিখাইল নুআইমার মতে, শব্দ মূলত মূল্যহীন প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। শব্দের প্রকৃত মূল্য রয়েছে এর চিন্তা, অর্থ, আবেগ ও সংজ্ঞায়। তিনি বলেছেন কোনো প্রতীক বা চিহ্নের নিজের কোনো মূল্য নেই বরং এটি যা বোঝায় তা থেকে এর মূল্য অর্জিত হয়। তাই ভাষার কোনো নিজের মূল্য নেই। বরং এর মূল্য হলো এটা কিসের প্রতীক তার চিন্তা ও আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে।[১২১] জিবরানও নু'আইমা'র মতামতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং বলেন কবিরা ভাষাতে আত্মা ও সারমর্ম ছাড়া আর কিছুই খোঁজেননা। আর ক্লাসিক লেখকরা শব্দের গঠন ও আকৃতি সংরক্ষণ করে।[১২২]

জিবরানের লিখিত "আরবী ভাষার ভবিষ্যত" (مستقبل اللغة العربية) নামে একটি নিবন্ধে আরবী ভাষার ভবিষ্যত সম্পর্কে বলেন যে, আরবি ভাষার ভবিষ্যত নির্ভর করে বিদ্যমান সৃজনশীল চিন্তাভাবনার উপর। এটাই ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং বাঁচিয়ে রাখে। ভাষার উদ্ভাবন ক্ষমতা যা কবির হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। কবিরাই নতুন শব্দ সৃষ্টি করে আবার কোন কোন শব্দের বিলুপ্তির কারণও হয়।[১২৩]

---

১২১. মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল*, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪
১২২. হাবীব মাসউদ, *জিবরান হাইয়্যান ও মাইয়েতান* , ২য় সংস্করণ (বৈরুতঃ দার আল রিহানী, ১৯৬৬ খ্রি). ঈৃ-১৩২
১২৩. আন না'উরি ঈসা, *আবদ আল মাহজার(* কায়রোঃ দার আল মাআ'রিফ, ১৯৭৭ খ্রি.) পৃ-১৯৩

আবু মাদির মতে কবিতার প্রথমেই আসে অর্থের ব্যাপারটি। কিন্তু তিনি অর্থের সাথে সাথে কবিতার সুন্দর কাঠামোকেও গুরুত্বের সাথে দেখেন। যেমন তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই سِرَّ (রহস্য) শব্দটির অর্থ এর অভিব্যক্তি বা অর্থ প্রকাশের মাধ্যমেই বুঝা , গঠনের মাধ্যমে নয়। যদিও শব্দের সুন্দর অর্থের জন্য গঠনও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন।[১২৪]

আধুনিক যুগেও কবিতার ভাষার মধ্যে পুরনো ও নতুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। বিশেষ করে ভাষার ব্যাপারে সামাজিক মূল্যবোধ ও বিদেশী সাহিত্যে ভাষার ব্যবহার মধ্যে। নু'আইমা আরবী সাহিত্যে ভাষার এই দ্বন্দ্বটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি ভাগে সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। ভাষার উদ্দেশ্য সাহিত্য রচনার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ সাহিত্যই হবে এর উদ্দেশ্য। এই মতে, ভাষা ব্যবহারে কী বলা হয়েছে সেটা বিবেচনার বিষয় নয় বরং কিভাবে বলা হয়েছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।[১২৫]

আর দ্বিতীয় প্রকারের সমর্থকদের মতে, কী বলা হয়েছে সেটা প্রথমে বিবেচনা করে তারপর কীভাবে বলা হয়েছে সেটা দেখতে হবে। তাদের মতে সাহিত্য হলো চিন্তা ও আবেগ প্রকাশের একটি মাধ্যম, চিন্তা ভাবনার চেয়েও ভাষাকে তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কেননা ভাষার আগে চিন্তা, চিন্তার আগে আবেগ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি নু'আইমা'র মতে কবিতার ভাষা হল এক বিশেষ প্রতীক। যা চিন্তা ও আবেগ প্রকাশ করে। তার মতে এগুলো হলো শব্দের ইঙ্গিত। এটি এমন লেখকদের মনোযোগ দখল করেছে যার অর্থের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থের চেয়ে শব্দকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে আবার কেউ কেউ অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছে । তিনি তাদের দুই মতের লোকদের মধ্যে এমন সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন যেমন দেহের মধ্যে আত্মার সম্পর্ক। নু'আইমা'র তার প্রবন্ধ "ব্যাঙের কান্না' (نقيق الضفادع) রচনায় কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে শব্দের প্রকৃতি, কীভাবে সেগুলো ভাষা থেকে নিবেন তা স্পষ্ট করেননি

১২৪.আল হাজ্জ নি'মাহ, *আদ দিওয়ান* (বৈরুত: ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন,১৯৮২ খ্রি.) ১ম খন্ড,পৃ-১২

১২৫. মিখাইল নু'আইমা, *আল-গিরবাল* , প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯-১০০

এবং অর্থকেও

এবং অর্থকেও নির্দিষ্ট করেননি। বিষয়বস্তুতে পুরনো প্রথা থেকে মুক্তির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পুরনোকে পরিহার করে নতুন শব্দ ও অর্থ ব্যবহাররের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ব্যাপারে তার রচিত বই “আল গিরবাল” অন্যতম।

ভাষা ব্যবহারে প্রবাসী কবিদের মধ্যে এই বৈষম্য সমসাময়িক পশ্চিমা আরব লেখকদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিলো। তাই আমরা এমন ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় ব্যবহার করতে চাই যা কবিদের মাঝে বৈষম্য দূর করে। মিখাইল নু'আইমা সাহিত্যের ভাষার ব্যাপারেও সেভাবেই কাজ করেছেন। তিনি সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুদ্ধ ভাষার সাথে সাথে সাহিত্যের প্রয়োজনে বা সাধারণ মানব সমাজের চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের পক্ষেও মত দিয়েছেন।

৩. কবিতার সুর ও ছন্দ :

খলিল ইবনে আহমদ হলেন ছন্দশাস্ত্রের জনক। সেসময়ে স্পেনে উদ্ভাবিত স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত একাধিক অন্ত্যমিল বিশিষ্ট একপ্রকার আরবী কবিতা ছিল। এখান থেকেই আধুনিক যুগেও অন্ত্যমিল বিশিষ্ট কবিতার সূচনা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে কবিরা এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

মিখাইল নু'আইমা তার রচিত সমালোচনামূলক গ্রন্থ "গিরবাল" এ ছন্দ্রশাস্ত্র ও খলিল ইবনে ফারাহিদির ছন্দশাস্ত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করেন। নু'আইমা কবিতার অন্ত্যমিলকে সমর্থন করেননি। জায়ুশী বলেন যে, নু'আইমা'র অন্ত্যমিল বিশিষ্ট কবিতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। তার প্রবন্ধে এ আলোচনা ছিল অস্পষ্ট। নু'আইমা বলেন: কবিতার শেষে অন্ত্যমিল জরুরী নয়।[১২৬] তার রচিত (الشعر والشاعر) প্রবন্ধে বলেছেন অন্ত্যমিলের প্রয়োজন আছে কিন্তু কবিতায় শেষাংশে মিলের কোনো প্রয়োজন নাই।[১২৭] কবিতার ওযনকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে ওযনের মূল উদ্দেশ্য আবেগ ও চিন্তার প্রকাশে সমাঞ্জস্য এবং ভারসাম্য রক্ষা করা।[১২৮]

কবিতার অন্ত্যমিল নিয়ে নু'আইমা'র কাজকে আল খলিল বিন আহমেদের বিরূদ্ধে একটি বিপ্লব বলে মনে করা হয়। নু'আইমা'র আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কবিতায় অন্ত্যমিল থাকতে পারে কিন্তু এটাই একমাত্র গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় নয়। কবিতার সুরও কবিতার শব্দ ও কাঠামোর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং নু'আইমা কবিতার সুরের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন আমাদের সুরের প্রয়োজন কারণ আত্মার মধ্যে শব্দ ও সুরের প্রতি এক অদ্ভুত আবেগ প্রবণতা রয়েছে।[১২৯]

---

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ, .১১২
[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৫
[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৭, সালমা আল খাদরা আল জায়ুসি, *আল ইজতিহাদি ওয়াল হারাকাতি ফি শের আল আরাবী আল হাদিস*, উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৭
[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ, ৭১

নু'আইমা'র আল-গিরবাল বইতে যা আলোচনা করা হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই যে, খলিল ইবনে ফারাহিদী কবিতার ওযন বলতে যা বুঝিয়েছেন নু'আইমা সেটা বোঝাননি। যেমন তিনি কবিতার ওযন বলতে এমনভাবে বুঝিয়েছেন এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ যেমন কোন উপাসনায় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে যা মানুষ মূল উপাসনার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর আবির্ভাবের কারণ ছিল কবির আবেগ ও চিন্তাধারার প্রকাশের জন্য প্রবণতা।

নু'আইমা আল খলিলের ছন্দশাস্ত্রে একমত নন কারণ পরবর্তীতে কবিরা এই ছন্দশাস্ত্র ও অন্ত্যমিল নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়েছিলেন যে কবিতার মূল গঠনই ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, “ছন্দশাস্ত্র কেবল আমদের কবিতার ক্ষতি করেনি বরং আমাদের সহিত্যকেও ক্ষতি করেছে।” কবিতার মধ্যে ছন্দ এনে তিনি কবিতাকে জনসাধারণের চোখে শিল্পে পরিণত করেছন।[১৩০]

কবিতা, যা আবেগ ও নতুন ধারণা চিন্তা প্রকাশ করতে সক্ষম এবং এমন ওযন বের করতে সক্ষম যা কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নু'আইমা'র সমসাময়িক কবিরা তার মতের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ তারা যখন নতুন বিষয়ের অনুসন্ধান করে তখন তারা এক বিশাল সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যায়। যেখানে প্রতিটি চিন্তার সাগরে ভিন্ন ভিন্ন আবেগ, অনুভূতি হলো এক একটি দরজা।[১৩১] আর এই জটিলতা শুরু হয়েছিল স্পেনের লোকদের দ্বারা মুওয়াশাহাত (স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত একাধিক অন্ত্যমিল বিশিষ্ট এক ধরণের কবিতা) এর মাধ্যমে। কবিতা সম্পর্কে নু'আইমা'র দৃষ্টিভঙ্গি প্রবাসী কবিদের প্রথাগত কবিতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। তারা তাদের কবিতাগুলো ছোট ছোট ওজনে সাজিয়েছিল। মুহাম্মদ আবদ আল-গণি হাসান উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের কবিতাগুলোকে ছোট ছোট ছন্দ ও লাইনে সাজিয়েছেন। যেমনটি আমরা রাশিদ আইয়্যুবির اغاني الدرويش ও রিয়াদ আর মালউফের ليلة الاحد কবিতায় দেখতে পাই।[১৩২]

---

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৮
১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৫
১৩২. মুহাম্মদ আবদ আল গনী আল হাসান, *আশ শির- আল আরাবি ফি আল মাহজার* , ৩য় সংস্করণ (কায়রো: মুয়াশ্শাহ, ফ্রাংকলিন,১৯৬২ খ্রি) পৃ. ১০৪

يا مرهقا كبدي * خفف ولا تزد

اتظل مبتعدا * عني وعن بلدي

ওহে আমার ক্লান্ত আত্মা আমার ভয়কে হালকা কর (আর ক্লান্তিকে বাড়িয়ে দিও না)

(তুমি কি) আমাকে আর আমার দেশকে দূরে রাখবে।

কবির অধিকার আছে নতুন শব্দ উদ্ভাবনের, তার স্বাধীনতা চর্চার ও ভাষাকে নতুন আলোয় প্রজ্বলিত করার।

এই স্বাধীনতা না থাকলে ভাষাগত বিকাশ হবে না। আরবী সাহিত্যের নবায়ন হবে না, সাহিত্যের সৌন্দর্য বাড়বে না।

আমাদেরকে নু'আইমা'র কথার উপর গুরুত্বরোপ করা উচিত তিনি বলেছেন "আরবি ভাষাবিদরা যদি আরবি ভাষার ইতিহাস দেখে তবে তারা কি দেখেনা যে আজ আমারা যে ভাষা ব্যবহার করি, পত্রিকা বা সংবাদপত্রে যে ভাষা ব্যবহার করি সেটা তামিল ও কুরাইশদের ভাষা থেকে আলাদা? তারা কি লক্ষ্য করে না যে তাদের পূর্বপুরুষরা যদি দুই হাজার বছর আগে আমাদের নিয়ন্ত্রন করতো তাহলে আমরা বর্তমানে যে ভাষা ব্যবহার করি সেটা আমাদের কাছে থাকতো না।"

গিরবাল নামক বিখ্যাত গ্রন্থের গুরুত্ব এখানেই নিহিত। এটি সত্যিই আরবি ভাষা সম্পর্কে যত্নশীল। বিকাশ ও সংরক্ষনে সহায়ক একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ বই। কিন্তু কিছু ভাষাবিদ ভাষাকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় ভাষার নতুনত্ব ও প্রসারতা চায়না।

সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারে কেন এতো জটিলতা থাকবে? ভাষা হবে সহজ, প্রাঞ্জল। সাহিত্যের ভাষা হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃহ ভাষার মতো আপন ও সহজবোধ্য। গিরবালের শেষাংশ শিখাইল নু'আইমা'র বই "আল গিরবাল" এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সাধারণ সাহিত্যিক মান বিশ্লেষনের মাধ্যমে আমরা যেই ফলাফল পাই সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

*নু'আইমা'র সাহিত্যের মান চাহিদা যথা আবেগ, সৌন্দর্য, সত্য ও ছন্দ। মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদার সাথে সাথে রোমান্টিক চাহিদার প্রয়োজনেও কবিতা রচনা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কলপনায় ভাষার শৈল্পিক চিত্র উপস্থাপন করতে হয়।

*নু'আইমা তার কাবিতার সমালোচনায় কিছু প্রাচীন প্রথা ও আধুনিক প্রথার মধ্যে ভারসাম্য আনেন।

*নু'আইমা পশ্চিমা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার সাহিত্যেও তার কিছুটা ধাচ রয়েছে।

*শব্দের চেয়ে অর্থের দিকে নু'আইমা'র বেশি মনোযোগী হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি তার লেখার শাস্ত্রীয় ভাষা পরিহার না করে ও তৎকালীন অধিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

*তার মতে সুর কবিতার জন্য প্রয়োজন কিন্তু অন্তমিল বাধ্যতামূলক নয়। কখনো এটা প্রয়োজন আবার কখনো এটা অত্যাবশ্যকীয় নয়।

*তিনি সেই ছন্দ সুরের বিশ্বাস করেন যেগুলো নির্দিষ্ট রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেগুলো গবেষণা অনুসারে চিন্তা ও আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট।

*নু'আইমা তার কবিতার ভাষার অন্তমিল ও ছন্দ থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছেন। তিনি কবিতার আধুনিকীকরনে কাজ করেছেন।

মিখাইল নু'আইমা আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে ও আধুনিকীকরণে অনেক কাজ করেছেন। সাহিত্যের ভাষা, কবিতার সুর ও ছন্দ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। সাহিত্যের প্রয়োজনে নতুন শব্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন। সাহিত্য সমালোচনা কেমন হবে, সমালোচকের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, সমালোচনার মাধ্যমে কিভাবে সাহিত্যের উন্নয়ন ঘটানো যায় এই সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নু'আইমা তার বিভিন্ন বিষয়ে যৌক্তিক সমালোচনার মাধ্যমেই তিনি অন্যান্য সমালোচকদের থেকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছেন। আরবী সাহিত্যকেও করেছেন আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ ।

উপসংহার

মিখাইল নু'আইমা আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও আলোকিত নাম। যিনি আরবী সাহিত্য সমালোচনাকে আধুনিক সমালোচনার উন্নীত করেছেন। তিনি কবিতায় অন্তমিল ব্যবহারের বিপক্ষে কথা বলেছেন। আরবী সাহিত্যে শুধু পুরনো বা গতানুগতিক শব্দ ব্যবহার না করে আধুনিক ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষে কথা বলেছেন।

তিনি গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে আধুনিক ছোটগল্প, নাটক ও কবিতা রচনা করেছেন। নাটকে তিনি স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তার প্রেরিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন চিঠিপত্রও ছিলো অনেক সাহিত্য ও জ্ঞান সমৃদ্ধ।

নু'আইমা সমালোচনা সাহিত্যের জগতে এক নতুন দ্বার উম্মোচন করেছেন। তিনি সাহিত্যের উম্মুক্ত সমালোচনার কথা বলেছেন। আবার যেনতেনভাবে যেন সাহিত্য সমালোচনা না হয় সেকথাও বলেছেন। একজন সমালোচকের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, কীভাবে সাহিত্য সমালোচনা করতে হবে, কীভাবে সাহিত্য রচনা কররে সে সাহিত্য সমাজের কল্যান হবে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে গিয়ে, কারো মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য রচনা না করে পাঠকের জন্য সাহিত্য রচনা করতে বলেছেন।

মিখাইল নু'আইমা আরবী ছাড়াও ইংরেজী রাশিয়ানসহ বহুভাষায় পারদর্শী হওয়ায় তার সাহিত্যেও অন্যান্য ভাষার প্রভাব ছিলো। প্রবাসে বসেও তিনি মাতৃভাষা আরবীর আধুনিকায়নের জন্য, আরবী ভাষার উন্নতির লক্ষ্যে প্রবাসী লেখকরা মিলে আর রাবিতাহ কালামিয়্যাহ গঠন করেন। যাতে সব প্রবাসী লেখকরা একসাথে আরবী ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করতে পারেন।

তিনি কবিতায় ছন্দমিলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব না দিয়ে অন্তমিলবিহীন নতুন শৈলী ব্যবহারের কথা বলেছেন গদ্যের সাথে সাথে পদ্যও সহজ সরল ও ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহারের কথা বলেছেন। নু'আইমা সমালোচনার ক্ষেত্রে যে নতুন নীতির কথা বলেছেন, সেগুলোই তাকে সমসাময়িক অন্যান্য কবি ও লেখকদের থেকে আলাদা করেছে। তার ছন্দবীহিন নতুন মডেলের কবিতার মধ্যে হাফস আল জুফুন উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য লেখক যেখানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের সামান্য দুর্বলতা বা ভাষা প্রকাশে সামান্য শিথিলতা মেনে নিয়েছেন, নু'আইমা এগুলো কিছুই মেনে নেননি। তিনি নতুন শব্দ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন। তার শব্দ ভান্ডারও ছিলো অনেক সমৃদ্ধ। তার সমৃদ্ধ শব্দ ভান্ডারের সাথে সাথে সেগুলো প্রকাশের ক্ষমতাও ছিলো অনেক আকর্ষণীয়। তার বক্তৃতায় ভাষা ছিলো মনোমুগ্ধকর, কল্পনাশক্তি ছিলো অসম্ভব প্রখর ও প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিলো মানুষকে আকৃষ্ট করার মতো। তার লেখার এক ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনি অনেক চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে লেখতেন।

তার বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ হলো আল গিরবাল যার অর্থ চালুনী, এই বইতে তিনি চালুনীর মতো ছেঁকে ছেঁক সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলোরও সমালোচনা করে আরবী সাহিত্যের নবজাগরণের পক্ষে কাজ করেছেন। মূলত গিরবাল এমন একটি বই, যেই বইটি তৎকালীন সময়ে যেমন প্রয়োজনীয় ছিলো তেমন আজকের দিনেও সাহিত্য সমালোচনার জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নু'আইমা'র মতে, সাহিত্য রচনায় ভাষাগত স্বাধীনতা না থাকলে ভাষায় বিকাশ ঘটেনা, আর ভাষার বিকাশ না ঘটলে সাহিত্যের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হয় না।

নু'আইমা তার সুচিন্তিত মতামত ও সমালোচনার দ্বারা কবিতার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। তার কবিতা ছিলো নতুন বিষয় নিয়ে ও চমৎকার শৈলী দ্বারা সাজানো। তিনি তার কবিতায় শোক দু:খ, আনন্দ, বেদনা, আধ্যাত্মিক ও আবেগের বিষয় সম্পূর্ন নতুন ধারায় সাজিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন। সাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণেই তিনি নিজে সাহিত্য রচনার পাশা পাশি সাহিত্যের সঠিক সমালোচনার মাধ্যমে সাহিত্যের উন্নতি সাধিত করতে চেয়েছেন।

নু'আইমা ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, বহুভাষাবিদ ও ক্ষুরধার লেখন, তিনি ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সাহিত্যিক কবি ও বিভিন্ন বিষয়ে এক পারদর্শী লেখক। নু'আইমা'র কবিতা বিশ্লেষন করলে দেখা যায় তিনি প্রথমে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কবিতা রচনা করলেওপারে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয় আধ্যাত্মিক ও ভালোবাসা নিয়ে কবিতা রচনা করে আধুনিক কবিতার মডেল উপস্থাপন করেন।

সমসাময়িক আরবী সাহিত্য নিয়ে নু'আইমা'র সমালোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিলো সেই সময়ের লেখকদের মাঝে আন্তরিকতার অভাব। তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলো বলেই তিনি তাদের সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা করেন।
নু'আইমা'র সমালোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলো যুক্তিনির্ভর তিনি মনে করতেন মানুষকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের আবর্তন হওয়া উচিত এবং মানুষের প্রয়োজনেই সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। মূলত মানব কল্যাণেই তিনি সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন।

তিনি কবিতার সমালোচনা করে কবিতাকে পুরনো ধ্যান ধারনা গঠন থেকে মুক্ত করে অন্ত্যমিল বিহীন নতুন কাবিতার কথা বলেছেন। প্রথাগত সমালোচকদের মতে, খলিল ইবনে ফারহিদীর কাছে কবিতার ছন্দ অন্ত্যমিলই যদি কবিতার মূল স্তম্ভ হয়, তবে নু'আইমা'র কাছে সুরও কবিতার জন্য এক গুরুত্বপূর্ন উপাদান। কিন্তু তিনি এটাকে পরিহারের কথা বলেছেন। কবিতাকে শুধুমাত্র ছন্দ ও অন্ত্যমিলের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে চিন্তা ও আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সেভাবে কবিতা রচনার কথা বলেছেন।

ইসলাম ও মুসলিমের ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত আরবী ভাষা ও সাহিত্যেও আধুনিকায়নে বিখ্যাত সমালোচক মিখাইল নু'আইমা'র অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্যে নতুন শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োজনে কথ্য ভাষার ব্যবহারে নু'আইমা'র অবদান সত্যিই অবিস্মরণীয়। তিনি তাঁর যৌক্তিক সমালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত দ্বারা সাহিত্য জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য ছিলো আধ্যাত্মিক ও আবেগের সংমিশ্রণে রচিত। অন্ত্যমিলবিহীন কবিতা, সাহিত্যে নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার, পুরনো রীতিকে পরিহার ও গঠনমূলক সাহিত্য সমালোচনার কারণেই আধুনিক আরবী সাহিত্যে মিখাইল নু'আইমা'র নাম এক উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আল কুরআনুল কারীম

২. মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, বৈরুত: দারুল ইলম লিলামালাইন,১৯৮৭ খৃ, প্রথম খন্ড

৩. মিখাইল নু'আইমা,আন্নাহরুল মুতাজাম্মিদ,*হাফস আল জুফুন*, বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৯৮৭ খৃ.

৪. মিখাইল নু'আইমা, *সাবউন*, *মাজমুআ আল কালিমাহ*, , বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাইন, ১৯৭৯খৃ., ১ম খন্ড,

৫. মিখাইল নু'আইমা,*হামছ আল জুফুন*, *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ*, বৈরুত: দার আল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৬ খৃ., চতুর্থ খণ্ড

৬. মিখাইল নু'আইমা, *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ*, ৬ষ্ঠ খন্ড

৭. মিখাইল নু'আইমা ,"ইয়া ইবন আদম", *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* , বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাইন, ১৯৮৭খৃ., ৭ম খন্ড,

৮. মিখাইল নু'আইমা, "আল গিরবাল", *আল মাজমুআতি আল কালিমাহ্*, তৃতীয় খণ্ড,দারুল ইলম লিলমালাঈন ঃ বৈরুত, ১৯৭৪

৯. ·মিখাইল নু'আইমা, *আল গিরবাল আল জাদীদ*, বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাইন, ১৯৭২ খৃ.

১০. .মিখাইল নু'আইমা, "রাসাইল" *আল মাজমু'আ আল কালিমাহ* ,অষ্টম খন্ড

১১. মিখাইল নু'আইমা, আব'আদু মিন মস্কো ওয়ামিন ওয়াশিংটন ,দারুস সন্দির: বৈরুত, ১৯৬৬ খৃ.

১২. মিখাইল নু'আইমা, "আওরাকা আল খারিফ", হাফস আল জুফুন, বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭

১৩. মিখাইল নু'আইমা, জিবরান খলিল জিবরান , বৈরুত: নাওফেল ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫খৃ.

১৪. মিখাইল নু'আইমা ,*আবু বাত্তাহ* (ابو بطة), বৈরুত ঃ লেবানন, নওফেল পাবলিকেশন্স, ১৯৫৮ খৃ.

১৫. মিখাইল নু'আইমা,*কালিমাতুন নাশের লিলমাজমুআতিল কালিমাহ*, বৈরুত: দারুল ইলম লিলমাঈন, ১৯৮ ৭খৃ.

১৬. মিখাইল নু'আইমা, *"মিন আনতা ইয়া নাফসি" হামস আল জুফুন* ,বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালাঈন ১৯৮৭ খৃ.

১৭. মিখাইল নু'আইমা, আল মারাহিল, *আল মজেমুআ আল কালিমাহ*, প্রাগুক্ত, ভলিউম-৫

১৮. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফি তারিখীল আদব আল আরাবী আল আদব আল হাদীস*, বৈরুত: দায় আল জিয়াল আত তাবয়াতী ছানীয়া, ১৯৯৫ খৃ.

১৯. মুহাম্মদ আবদ আল গনী আল হাসান, *আশ শির- আল আরাবি ফি আল মাহজার*, ৩য় সংস্করণ,কায়রো: মুয়াশ্‌শাহ, ফ্রাংকলিন, ১৯৬২ খৃ.

২০. ড. নাদিরা জামিল আল সাররাজ, *ছালাছাতু রুয়্যাদ মিনাল মাহজার* ,কায়রো: দার আল মা'আরিফ , ১৯৮৬ খৃ.

২১. কায়াদী ফারহাদ কায়াদী , *মীখাইল নু'আইমা বাইনা কারিইহী ওয়া আরিফীহী* , বৈরুত : ১৯৭১ খৃ.

২২. ড. মানাহ খাউরি, *মিখাইল নু'আইমা আমলাক আবরুহী ওয়াল কালাম আমমাজলি*, আমেরিকান তথ্য সংস্থা, ১৯৮৮ খৃ.

২৩. ড. সাইয়্যেদ হামিদ আননাসাজ , *আল আদাব আল আরবী আল হাদীস* ,কায়রো : আমিরি প্রেস অ্যাফেয়ার্স জেনারেল অথরি, ১৯৯৪-১৯৯৫ খৃ.

২৪. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হাদ্দারাহ, *দারাসাত ফি আল শির আল-আরবী আল হাদীস* , বৈরুত: দার আল-উলুম আল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৮ খৃ.

২৫. ইনআম আল জুনদি, *আররাইদ ফিল আদাব আল আরবী*, বৈরুত: দারুল আল রাইদ আল আরাবি, ১৯৮৬খৃ.

২৬. প্রফেসর আবদুল হালিম নদভী, *আরাবী আদব কাই তারিখ আহদী জাহেলীয়াত ছি আছরি লিহাদারিতিকা*, ৪র্থ খন্ড

২৭. আহমদ আমীন, *আল-নক্‌দ আল-আদাবী*, কায়রো : মাকতাবা আল-নাহদা আল-মিসরীয়্যা, ১৯৮৩ খৃ. ১০খণ্ড,৫ম সংস্করণ

২৮. আহমদ আল সাইব,*উসুলুস নাক্‌দ আল-আদাবী* বাদী আল যামান, ২য় মাকামাত

২৯. ইবন কুতাইবা, *আল-সি'রওয়া আল-সু'আরা* ,কায়রো : ১৯৩২খৃ.

৩০. ড. নাদিরা জামিল আর সাররাজ, *শুআরা আল রাবিতা আল কলামিয়্যাহ* ,কায়রো: দার আল মা'আরিফ , ১৯৮৯ খৃ.

৩১. মুহাম্মদ নুর -অর- রশীদ, *মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্‌জার আল আমরিকি*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬

৩২. ড. সাইয়্যেদ হামিদ আননাসাজ ওয়াআখরুন, *আল আদাব আল আরবী আল হাদীস*, কায়রো : আমিরি প্রেস অ্যাফেয়ার্স জেনারেল অথরি ,১৯৯৪-১৯৯৫

৩৩. মুহাম্মদ মানছুর, *আন্ নাক্‌দু ওয়ান নাক্কাদ আলমুহাসিরিন*, নাহদাতুল মিসর, কায়রো: ২০০২খৃ.

৩৪. সায়্যিদ শফি আল-দ্বীন, *আর রাবাতিয়্যাহ আল কলামিয়্যাহ ফী আন্ নাক্‌দ আল আরাবী আল হাদীস*, কায়রো: ১৯৭২

৩৫. জোসেক খাওরি তাওক, *দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মিখাইল নু'আইমা*, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত : দার্নো প্রেস, ১৯৯৯খৃ. সপ্তম খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড.

৩৬. ইবন্ মানযুর, আবুল ফাদ্‌ল জামাল আদ-দ্বীন মুহাম্মদ বিন মুকাররম, *লিসানুল আরব* বৈরুত: দারুস সাদের ১৯৯৭, ১১তম খণ্ড

৩৭. মুহাম্মদ মানছুর, আন নক্‌দ ওয়ান নাক্কাদ আল মুআসিরিন।

৩৮. মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, রোমান্টিসিজম,কায়রো: নাহদাতু মিসর

৩৯. শুকরি আজিজি আল-মাদি, *ফি নাজরিয়াতে আল আদাব*, ভলিউম-১ ,বৈরুত: দার আল মুনতাখাব আল-আরবী, ১৯৯৩খৃ.

৪০. আহমদ আশ শুয়াইব, *উসুলুস নাক্দ আর আদাবী*, বৈরুত: মাকতাবাতু নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৩, দশম সংস্করণ

৪১. মুহাম্মদ গুনাইমি হিলাল, *আন নাক্দ আল আদাব আল হাদীস*, বৈরুত : দার আস সাকাফা ওয়া দার আল আওদাহ, ১৯৭৩ খ্রি.

৪২. আল-জাহিয আবু উসমান আমর বিন বাহর, *কিতাব আল হায়ওয়ান*, সম্পাদনা: আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, ২য় সংস্করণ, লেবানন: দারুল জীল, ১৯৬৫ খ্রি. প্রথম খণ্ড

৪৩. মুহাম্মদ আহমদ ইবনে তাবা তাবা আল আলী, *ইয়ারু আশ-শে'র*, সম্পাদনা :আব্বাস আবদেল সাত্তার , বৈরুত: দার আল কুতুব ইসলামিয়া ২০০৫ খ্রি.

৪৪. আবুল ফারজ কুদামা ইবন্ জাফর, নাক্দ আশ্- শের, সম্পাদনা: কামাল মুস্তাফা, কায়রো: আল-খানজি লাইব্রেরি, বাগদাদ: আল মুথান্না লাইব্রেরি, ১৯৬৩ খ্রি.

৪৫. আবুল আলা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান আল মাআররী, *রিসালাতুল গুফরান*, সম্পাদনা: কামিল কিলানী, কায়রো হিন্দাভী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.

৪৬. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, এবং আল মাজিনি ইব্রাহিম আবদুল কাদের, *আদ দিওয়ান ফি আল আদাব ওয়ান নাক্দ*, কায়রো: হেনদভী ফাউন্ডেশন, ২০১৭খ্রি.

৪৭. ইসমাঈল ইজ আল দ্বীন, *আল আদাব ওয়াল ফুনুন: দিরাসাতুন নাক্দ*, অষ্টম সংস্করন, কায়রো: দার আল যিকর আল আরাবী, ২০১৩খ্রী.

৪৮. মুহাম্মদ বিন সালাম আল জুমাহি, *তাবাকাত ফাহুল আল শুআরা*, বৈরুত: দার আল কুতুব আল ইসলামিয়া, ২২০১খ্রী.

৪৯. আবু আলী আল- হাসান ইবনে রাশিক আল কিরওয়ানি, *আল উমাদা ফী সানাআতি শের ওয়ান নাক্দাহ*, খন্ড -১,

৫০. মুহাম্মদ বিন সালাম আল জামাহী, *তাবাকাত ফাহুল আল শুআরা* ,প্রাগুক্ত, পৃ ২৪

৫১. আবু আলী আল- হাসান ইবনে রাশিক আল কিরওয়ানি, *আল উমাদা ফী সানাআতি শের ওয়ান নাক্দাহ*, খন্ড -১

৫২. আল রাফিই, মুস্তফা সাদিক, *তারিখ আদাব আল আরব*, (কায়রো: হিন্দাভী ফাউন্ডেশন,২০১৩খ্রী), ১ম খন্ড

৫৩. ইবনে তাবাতাবা, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে অহমদ, ইয়ার আশ- শের, পৃ-২১

৫৪. আবু হিলাল আল হাসান বিন আবদুল্লাহ ইবনে সাহেল আল আসকারি, *আসসানাআতাইন : আল কিতাবাহ ও শির*

৫৫. আস-সাঈদ আল বায়ুমি, *লুগাতির শির আল আরাবি আল হাদিস*, ২য় সংস্করন, কায়রো: দার আল মাআরিফ, ১৯৮৩ খৃ.

৫৬. মুস্তফা মান্দুর, *আল লুগাহ ওয়াল হাদারাহ্*, কায়রো: মানশায়াত আল মারেফ, ১৯৭৪খৃ .

৫৭. মুহাম্মদ মান্দুর, *ফি আল মিযান আল জাদিদ*, ভলিউম ১, তিউনিশিয়া: কোতাইব প্রেস, ১৯৮৮ খৃ.

৫৮. মুস্তফা মান্দুর, *আন নাকদ ওয়ান নাকদ্ আল মুআসসিরিন*

৫৯. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল, *সুরাতিল আদাব*, কায়রো: হিন্দাভী ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন এন্ড কালচার ২০১২ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৬০. আহমদ আমিন, *আত্ তাজদিদী ফিল আদাব*, আল রেসালা ম্যাগাজিন, ভলিউম ৬, ১ এপ্রিল, ১৯৩৩খৃ.

৬১. মুহাম্মদ মোস্তফা হাদারা, আত্ তাজদিদী ফি শির আল মাহজার, ১ম সংস্করণ,বৈরুত:দার আল যিকর আল আরাবি, ১৯৫৭ খৃ.

৬২. সালমা আল খাদরা আল জায়ুসি, *আল ইজতিহাদি ওয়াল হারাকাতি ফি শের আল আরাবী আল হাদিস*, অনুবাদ: আবদুল ওয়াহেদ লুলু'আ ,২য় সংস্করণ, বৈরুত: আরব ইউনিট স্টাডিজ কেন্দ্র, ২০০৭খৃ.

৬৩. হাবীব মাসউদ, *জিবরান হাইয়্যান ও মাইয়েতান* , ২য় সংস্করণ, বৈরুত: দার আল রিহানী, ১৯৬৬ খ্রি.

৬৪. আন না'উরি ঈসা, *আবদ আল মাহজার*, কায়রো: দার আল মাআ'রিফ, ১৯৭৭ খ্রি.

৬৫. আল হাজ্জ নি'মাহ, *আদ দিওয়ান*, বৈরুত: ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন,১৯৮২ খ্রি. ১ম খন্ড

৬৬. মুহাম্মদ নুর -অর- রশীদ, মিখাইল নু'আইমা ওয়াখিদমাতুহু ফি আদাবিল মাহ্জার আল আমরিকি, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬

৬৭. সালমা আল খাদরা আল জায়ুসি, *আল ইজতিহাদি ওয়াল হারাকাতি ফি শের আল আরাবী আল হাদিস*

৬৮. Hussein Muhammad Ali Dabbagh, Mikhail Naimy : some aspects of his thought as revealed in his writing,January 1968

৬৯. S. MORE MODERN ARABIC POETRY, 1888-1970 ,LIEDEN: E.J.BRIL ,1976

৭০. John A Hayuood Modern Arabic Literature, 1800-1970 , London ,1971

৭১. Ismat Mahdi , Modern Arabic Literatuer 1900-1967, Hyderabad Andhra Pradesh India, 1983

৭২. Salma Khadra Jayyusi, Trends and movements in Modern Arabic poetry

৭৩. A History of Modern Arabic literature, K.M. Dawird: Clarendon press, 1998

৭৪. Sergei A shuiskii: Same Observations on Modern Arabic Autobiography' Journal of Arabic Literature, Vol Xlll

৭৫. M.H. Bakalla, Arabic Culture, Ko 263-64, Ai Ashmawi, M.2, "Arab Contribution to literary Criticism" VL-14

৭৬. P. Cachia, Taha Hussayn

৭৭. Khalafallah Muhammad, "Some Landmarks of Arab achievements in the field of Literary criticism", Bulletin Of the Faculty of Arts, Alexandria University Press (Egypt 1961)

৭৮. As quoted by M.M Badawi, A critical Introduction to Modern Arabic poetry

৭৯. Among Arabic Manuscripts, by Professor kratchkovsky Pg-57

৮০. Standard of Michael Nuaima's Poetry Criticism in his Book (Al-Girbal): A critical Study, করেন জার্নাল অফ লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড লিটারারি স্টাডিজ

৮১. Standard of Michael Nuaima's Poetry Criticism in his Book (Al-Girbal): A critical Study, Journal of Linguistics and Literary Studies, The second issue, Twelfth year

৮২. মো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্যে সমালোচনা,ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী,ডিসেম্বর ১৯৮৯খৃ.
৮৩. নিকোলাই গোপাল, রচনা সপ্তক ,মস্কো: রাগুদা প্রকাশন, ১৯৮৭ খৃ.
৮৪. নেছার উদ্দিন আহমদ, প্রবাসে আরবী সাহিত্যঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অভিসন্দর্ভ , ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
৮৫. আল আকলাম ম্যাগাজিন, দশম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৭৫)

ইন্টারনেট :

৮৬. https://www.google.com/search?q=mikhail+Nuaima&oq=mikhail+Nuaima
৮৭. https://bn.wikipedia.org/wiki/ সাহিত্য- সমালোচনা
৮৮. https//www.researchgete.net/publication/33992917-Theosophy-romanticism-and-love-in the poetry of Mikhail Naimy.
৮৯. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/clearcut27/30095637
৯০. https//www.resewrehgete.net/publication/33992917-Theosophy-romanticism-and-love-in the poetry of Mikhail Naimy
৯১. https://www.millioncontent.com/2021/09/blog-post_738.html
৯২. https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/shahitto-shamoiki/94479/
৯৩. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/chonchalmahbub/30040229
৯৪. https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/shahitto-shamoiki/94479/
৯৫. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6699
৯৬. https://infobd266.blogspot.com/2021/12/blog-post_75.html
৯৭. https://www.britannica.com/art/Arabic-literature/Literary-criticism
৯৮. https://literariness.org/2020/12/17/arabic-literary-theory-and-criticism/
৯৯. https://www.amazon.com/Mikhail-Naimy-al-Ghirbal-Selections-Introduction/dp/1090240597
১০০. https://www.swapybooks.com/author/masum/
১০১.https://bn.wikipedia.org/wiki/ কবিতা
১০২. https://nagorik.prothomalo.com/durporobash/ কবিদের-ভাবনায়-কবিতার-সংজ্ঞা